সংগ্রামী হাতিয়ার

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মুখপত্র

সেপ্টেম্বর, ২০১৯ ■ ৪৮তম বর্ষ ■ পঞ্চম সংখ্যা ■ মূল্য দু'টাকা

ব্রিটেনে সংসদ চালু রাখার দাবীতে বিক্ষোভ

কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ও জাতীয় ফেডারেশনের ডাকে

৮ জানুয়ারি ২০২০

সর্বভারতীয় ধর্মঘট

১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯

বেতন কমিশনের বঞ্চনার বিরুদ্ধে রাজ্যজুড়ে কর্মচারীদের বিক্ষোভ

ষষ্ঠ বেতন কমিশনের সম্পূর্ণ রিপোর্ট প্রকাশ করার দাবী জানিয়ে এবং বেতন কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রকাশিত রোপা রুলস্ ২০১৯-এ মহার্ঘ ভাতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরবতা, এরিয়ার পে প্রদানে অস্বীকৃতি এবং বাড়ি ভাড়া ভাতার হার হ্রাস করার প্রতিবাদে সেপ্টেম্বর মাসের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সপ্তাহে কলকাতা সহ বিভিন্ন জেলায় সংগঠনের ডাকে বিক্ষোভ কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়।

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত ট্রেড ইউনিয়ন গণকনভেনশনে বক্তব্য রাখছেন সিআইটিইউ'র সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তপন সেন। এই কনভেনশন থেকেই আগামী বছর ৮ জানুয়ারি কেন্দ্রীয় সরকারের দেশ বিরোধী নীতির বিরুদ্ধে সর্বভারতীয় ধর্মঘটের ঘোষণা করা হয়।

ষষ্ঠ বেতন কমিশন সম্পর্কে সাধারণ সম্পাদকের বিবৃতি

কেন্দ্রীয় সরকার জুলাই, ২০১৯ থেকে আরও ৫ শতাংশ মহার্ঘভাতা ঘোষণা করেছে। সুতরাং রাজ্য কোষাগার থেকে বেতনপ্রাপ্ত কর্মচারী, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের বকেয়া মহার্ঘভাতার পরিমাণ অসংশোধিত বেতনক্রমে দাঁড়ালো ৫৬ শতাংশ এবং সংশোধিত বেতনক্রম অনুযায়ী এর পরিমাণ ১৭ শতাংশ। অথচ 'রোপা রুলস ২০১৯' এ মহার্ঘভাতা নিয়ে কোনো কথা বলা হয়নি। পাশাপাশি এরিয়ার পে দিতেও অস্বীকার করা হয়েছে। বাড়ি ভাড়া ভাতার হার হ্রাস করা হয়েছে। ৩১.১২.২০১৫ বা তার আগে যেসমস্ত কর্মচারী অবসর গ্রহণ করেছেন, তাঁদের পেনশন নির্ধারণের ক্ষেত্রে ৪০ শতাংশ ফিটমেন্ট ওয়েটেজের কথা বলা হয়নি।

বোর্ড-কর্পোরেশন, পঞ্চায়েত ও মিউনিসিপ্যালিটির কর্মচারীদের সামঞ্জস্যপূর্ণ আদেশনামা বা ম্যাচিং অর্ডার এখনও পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি। স্বভাবতই এই বেতন কমিশনের সুপারিশ ও রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত কর্মচারীদের মধ্যে ক্ষোভ সৃষ্টি করেছে। সংগঠনের পক্ষ থেকে এই বিষয়ে রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ সহ আগামীদিনে রাজ্যব্যাপী ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে। এখন থেকে প্রস্তুতি গড়ে তুলুন।

বিজয়শংকর সিংহ

সাধারণ সম্পাদক

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি

আমরা গর্বিত

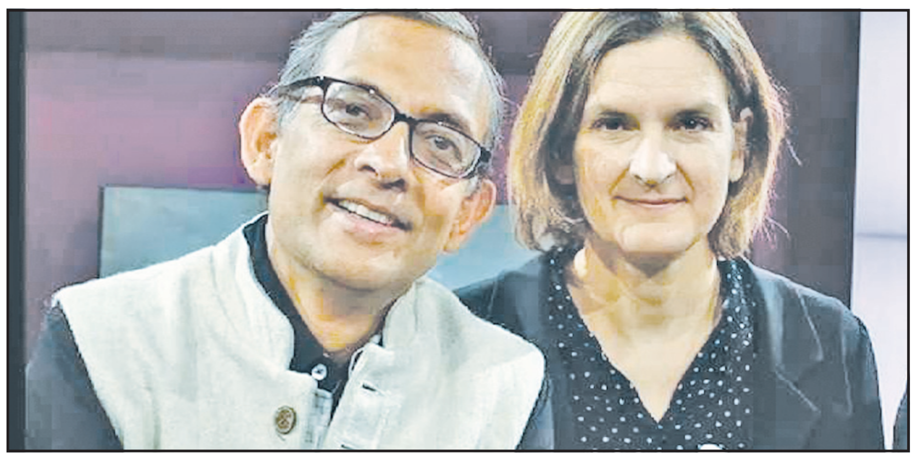

বিশ্ব দারিদ্র দূরীকরণে পরীক্ষামূলক এক নতুন পথের সন্ধান দিয়ে অর্থনীতিতে এবছর নোবেল পেলেন বাংলার সন্তান অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর স্ত্রী এস্থার ডুফলো।

অর্থ দপ্তরের অধিকর্তাকে সংগঠনের পত্র

Memo No. Co-ordi/62/19 Date : 16.10.2019

To
The Addl. Chief Secretary
To the Govt. of West Bengal
Finance Department
Nabanna, Howrah.

Sub : To provide us a copy of the report of recommendations submitted by 6th Pay Commission.

Sir,

You are well aware that 6th Pay Commission has submitted their recommendations on 13th September, 2019. But it was not yet brought to the domian of public knowledge.

Being a responsible and representative body of entire Sate Government Employees, Federations & Unions, we need to examine the approach and recommendations of the 6th Pay Commission.

In this context, we would fervently request you to kindly provide us a copy of the report containing the recommendations of the 6th Pay Commission at an early date & oblige.

With thanks,

Sincerely yours,
Bijoy Sankar Sinha
(Bijoy Sankar Sinha)
General Secretary

মুখ্যমন্ত্রী সমীপে সংগঠনের পত্র

স্মারক সংখ্যা ঃ কো-অর্ডি/৬৩/১৯ তারিখ ঃ ১৬/১০/২০১৯

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী,
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
নবান্ন, হাওড়া

বিষয় ঃ রাজ্য সরকার অনুমোদিত 'রোপা রুলস্ ২০১৯' সংক্রান্ত

মহাশয়া,

রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে, অবশেষে ষষ্ঠ বেতন কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে রাজ্য সরকার কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত উভয় অংশের কর্মচারীদের বেতন, ভাতা ও পেনশন সংশোধন সংক্রান্ত নির্দেশিকা (রোপা রুলস্ ২০১৯) প্রকাশ করেছে। যা স্বস্তিদায়ক হিসেবেই বিবেচিত হওয়া উচিত। কিন্তু প্রসঙ্গটি অপ্রিয় হলেও সত্যি, নির্দিষ্ট কয়েকটি কারণে, উপরোক্ত নির্দেশিকাটিকে বর্তমান অবস্থায়, সম্পূর্ণ স্বস্তিদায়ক - এ কথা বলা সম্ভব হচ্ছে না। বিশেষত বকেয়া মহার্ঘভাতা প্রসঙ্গে সম্পূর্ণ নরীবতা, ২০১৬ সালের ১ জানুয়ারী থেকে ২০১৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বর্ধিত বেতনের বকেয়া অংশ বা 'এরিয়ার পে' প্রদানে সম্পূর্ণ অস্বীকৃতি এবং বাড়ীভাড়া ভাতার হারের অবনমনের বিস্ময়কর সিদ্ধান্তে কর্মচারী সমাজ হতাশ ও উদ্বিগ্ন।

আপাততঃ এই বিষয়গুলি সম্পর্কে (যেহেতু ষষ্ঠ বেতন কমিশনের সুপারিশের অনুলিপি এখনও আমরা হাতে পাইনি) আপনার নেতৃত্বে পরিচালিত মন্ত্রিসভার সুচিন্তিত পুনর্বিবেচনা এবং তার ভিত্তিতে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে বলে আশা রাখি।

পাশাপাশি, বেতন কমিশনের আওতাভুক্ত শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীসহ বিভিন্ন বোর্ড, কর্পোরেশন ও পঞ্চায়েত স্তরের কর্মচারীদের বেতন-ভাতা সংশোধন সংক্রান্ত সামঞ্জস্য পূর্ণ আদেশনামা (ম্যাচিং অর্ডার) অতি দ্রুত প্রকাশের জন্য অর্থ দপ্তরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা প্রেরণের আবেদন জানাচ্ছি।

ধন্যবাদ সহ,

ভবদীয়
বিজয়শংকর সিংহ
(বিজয় শংকর সিংহ)
সাধারণ সম্পাদক

প্রসঙ্গ ঃ খসড়া জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১৯

মানস কুমার বড়ুয়া

বিগত ৩১ মে ২০১৯-এ ইসরোর প্রাক্তন প্রধান কে কস্তুরীরঙ্গন-এর নেতৃত্বে গঠিত কমিটি কেন্দ্রীয় সরকারের মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের কাছে জাতীয় শিক্ষানীতির খসড়া জমা দিয়েছে। ২০১৭ সালের জুন মাসে কেন্দ্রীয় সরকারের মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক এই টিম গঠন করে। ঐ রিপোর্ট ১ জুন সর্বসমক্ষে আসে এবং ৩১ জুলাই '১৯-এর মধ্যে মতামত জানাতে বলা হয়। প্রথমে মতামত জানানোর শেষদিন ধার্য ছিল ৩০ জুন, কিন্তু সমাজের নানা স্তর থেকে উঠে আসা আপত্তির ফলে তা বাড়ানো হয়েছে ৩১ জুলাই পর্যন্ত। এই কমিটিতে ডঃ কস্তুরীরঙ্গন ছাড়াও ছিলেন অধ্যাপক বসুধা কামাত (প্রাক্তন উপাচার্য), অধ্যাপক মঞ্জুল ভার্গব (গ্রিনস্টটন বিশ্ববিদ্যালয়, আমেরিকা) ডঃ রামশঙ্কর কুরিন (প্রাক্তন উপাচার্য), অধ্যাপক টি ভি কাট্টিমানি (উপচার্য, মধ্যপ্রদেশ), অধ্যাপক মাজহার আশিফ (জে এন ইউ), অধ্যাপক এম কে শ্রীধর (প্রাক্তন সচিব, কর্ণাটক নলেজ কমিশন), কৃষ্ণ মোহন ত্রিপাঠী (উত্তরপ্রদেশ মাধ্যমিক পরীক্ষা বোর্ডের প্রাক্তন চেয়ারম্যান)। এর সদস্য সচিব ছিলেন মন্ত্রকের বিশেষ অফিসার ড. শাকিল টি সামজু। এর আগে মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রীর প্রাক্তন ক্যাবিনেট সচিব টি এস আর সুব্রহ্মণ্যম-এর নেতৃত্বে একটি কমিটি করা হয় জাতীয় শিক্ষানীতির খসড়া তৈরি করার জন্য। সেই কমিটি ২০১৬ সালের মে মাসে রিপোর্ট জমা দিলে কেন্দ্রীয় সরকার একটি খসড়া জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১৬-র রূপরেখা প্রকাশ করে। নাম দেয় "Some inputs of Draft National Education Policy."

এই খসড়া রূপরেখা ২০১৬ সালে প্রকাশের পর তা নিয়ে চারিদিকে সমালোচনার ঝড় ওঠে। সংসদের উচ্চকক্ষে ঐ খসড়া ১১ আগস্ট, ২০১৬-তে উপস্থাপিত হলে সেখানেও প্রায় সমস্ত বিরোধী দল আপত্তি জানায়। সরকার তখন বিভিন্ন শিক্ষা সংস্থা, শিক্ষক সমাজ, বিশিষ্টজনসহ অন্যদের কাছে ওই খসড়া রূপেরেখা নিয়ে মতামত পাঠানোর জন্য আবেদন জানায়। যেসব মতামত জমা পড়ে সেগুলিসহ ঐ খসড়া রূপেরেখাকে বিচার বিশ্লেষণ করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক ডঃ কস্তুরী রঙ্গনের নেতৃত্বে কমিটি গঠন করে। সেই কমিটিই খসড়া জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১৯ রচনা করে।

খসড়া জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১৯ নিয়ে বিশদে আলোচনায় যাবার আগে কিছু কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন। এর আগে ১৯৮৬ সালে, অর্থাৎ ৩৩ বছর আগে শিক্ষানীতি সংক্রান্ত জাতীয় দলিল কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করেছিল। বর্তমান দলিলে তার কোন মূল্যায়ণে যাওয়াই হয়নি। অর্থাৎ ৩৩ বছর আগের সেই শিক্ষানীতির ইতিবাচক কার্যকরী দিক অথবা নেতিবাচক উপাদানগুলি নিয়ে কোন আলোচনা বর্তমান খসড়া দলিল-২০১৯-এ করা হয়নি। বিগত প্রায় সাড়ে তিন দশক ধরে শিক্ষাক্ষেত্র যে নানাবিধ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে, তা কতটা সামলানো গেল বা কতটা গেলনা তার মূল্যায়ন ছাড়া আকাশ থেকে পড়া কোন খসড়া দলিল কতটা বাস্তবিক সেই প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। এছাড়াও এই সময়কালে শিক্ষাক্ষেত্রে গৃহীত আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ যেমন জাতীয় স্বাক্ষরতা মিশন (প্রায় ৩০ কোটি মানুষ এখনও নিরক্ষর), শিক্ষার অধিকার আইন এবং দ্য ন্যাশনাল কারিকুলাম ফ্রেম ওয়ার্ক-২০০৫ ইত্যাদির কোনো মূল্যায়নে খসড়া জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১৯ সংক্রান্ত কমিটি যায়নি। ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রগতির ক্ষেত্রে আর্থ-সামাজিক চ্যালেঞ্জগুলিকে সামলানোর কোন দিশা এই খসড়া দলিল দেখাতে পারবে কি না তা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে।

অতীতের কোন মূল্যায়ণ ছাড়াই এই দলিলে শিক্ষাক্ষেত্রে আমুল পরিবর্তনের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। কারণ হিসাবে বলা হচ্ছে স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে শিক্ষাক্ষেত্রে সমতা নিয়ে আসার নানাধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হলেও, অতীতের শিক্ষানীতিগুলি উচ্চমানের প্রতিযোগিতায় সামিলই হয়নি। দলিত, আদিবাসী, ধর্মীয় ও অন্যান্য সংখ্যালঘু ও নারী —এই বঞ্চিত ক্ষেত্রগুলির সম-অধিকার নিশ্চিত করার জন্য যে সাংবিধানিক নিয়মকানুন আছে তাকেও এড়িয়ে গেছে বর্তমান দলিল। পরিবর্তে কিছু বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলে দায় সেরেছে।

১৯৪৯ সালের রাধাকৃষ্ণণ কমিশন থেকে শুরু করে স্বাধীন ভারতে শিক্ষানীতির নানা দলিল দেশের পুনর্গঠনে শিক্ষাকে একটি বিশিষ্ট ভূমিকা দিয়েছে এবং সেই লক্ষ্যে সংবিধানের উপক্রমণিকায় ঘোষিত নীতিগুলির বিশেষ উল্লেখ করেছে। কিন্তু বর্তমান দলিল এর মধ্যে দুটি বিষয় নিয়ে সন্দেহজনকগভাবে চুপ থেকেছে। তা হলো 'ধর্মনিরপেক্ষতা' ও 'সমাজবাদ'। খসড়ায় 'ভারতীয় শিক্ষা ঐতিহ্য' বলতে নির্দিষ্ট করা হয়েছে প্রাচীন ভারতের চিন্তাধারার এক সংকীর্ণ অংশের সঙ্গে। অথচ মধ্যযুগের জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা, উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীতে স্বাধীনতার আগে থেকেই প্রগতিশীল জ্ঞানচর্চার যে ধারাগুলি এই দেশে গড়ে ওঠে সেসব নিয়ে এই খসড়া প্রায় নীরব।

মন্ত্রকের বয়ান অনুযায়ী দলিলটি তৈরীর সময়েই ব্যাপক জনমত সংগ্রহের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গেছে। তার বিস্তারিত তথ্য এই দলিলে বর্ণিত আছে। অথচ দলিলের প্রদত্ত তথ্যেই দেখা যাচ্ছে যে এই জনমত গ্রহণের প্রক্রিয়া ছিল ভীষণভাবে অসম্পূর্ণ। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, সংবিধান অনুযায়ী শিক্ষা কেন্দ্র-রাজ্যের যুগ্ম দায়িত্ব হলেও সমস্ত রাজ্য থেকে মতগ্রহণ করা হয়নি। কেন্দ্রীয় ও রাজ্যস্তরের সরকারপোষিত দীর্ঘদিনের প্রখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির বেশিরভাগই বাদ পড়েছে এই প্রক্রিয়া থেকে। আবার জাতীয় স্তরে অনেক শিক্ষক ও ছাত্র সংগঠন থাকা সত্ত্বেও মতামত প্রদানকীরদের মধ্যে রয়েছে শুধু একটি ছাত্র সংগঠনের নাম। সেটি হলো আর এস এস নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত ছাত্র সংগঠন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ।

এই ধরনের নানা অসংলগ্নতা, অসম্পূর্ণতাকে যুক্ত করেই খসড়া জাতীয় শিক্ষানীতি২০১৯ নিয়ে খুব সংক্ষেপে আলোচনা করব। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রকের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত এই দলিলটি ৪৮৪ পৃষ্ঠার। খুবই গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি, যা ইতিমধ্যেই বিভিন্ন শিক্ষাবিদ তাঁদের আলোচনায় এনেছেন, তা নিয়েই এই নিবন্ধে আলোচনার অবতারনা।

খসড়া শিক্ষানীতি পর্যালোচনার আগে প্রথমেই দেখে নেওয়া যাক এখানে কি কিপ্রস্তাব রাখা হয়েছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, এই শিক্ষানীতি শিক্ষাক্ষেত্রে পাঁচটি চ্যালেঞ্জকে ধরতে চেয়েছে। সেগুলি হলো— (১) প্রবেশাধিকার ও সুযোগ (Access) , (২) সমতা (Equity), (৩) গুণ-মান (Quality), (৪) সাধ্যক্ষমতা (Affordability)। ৪৮৪ পাতার রিপোর্টটি চারভাগে বিভক্ত ঃ (১) বিদ্যালয় শিক্ষা (School Educaton), (২) উচ্চশিক্ষা (Higher Education), (৩) অতিরিক্ত অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় (Additional Key Focus Areas), (৪) শিক্ষার পুনঃগঠন (Transforming Education)।

বিদ্যালয় শিক্ষা

বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রস্তাব করা হয়েছে শিক্ষার অধিকার আইনের পরিধিকে বৃদ্ধি করে প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষা থেকে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা পর্যন্ত এই আইনের আওতায় আনা হোক, যাতে পরে ৩ বছর থেকে ১৮ বছর পর্যন্ত সমস্ত ছেলে-মেয়ে এর বিবেচনার সভায় আসতে পারে। এই ক্ষেত্রটির পুনর্গঠন করা হবে প্রাক-স্কুল থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত (উচ্চমাধ্যমিক বলে আলাদা কিছু থাকবে না) শ্রেণীগুলিতে ৫+৩+৩+৪ এই নতুন বিন্যাসের প্রবর্তন করে। অর্থাৎ (৩ বছর প্রাক্‌স্কুল এবং ১ম ও ২য় শ্রেণী) + (৩য়, ৪র্থ, ৫ম শ্রেণী) + (৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম শ্রেণী)+ (৯ম, ১০ম, একাদশ, দ্বাদশ শ্রেণী)। সমস্ত অঙ্গন ওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিকে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। অর্থাৎ বিদ্যালয় শিক্ষার সময়সীমা হবে ১৫ বছরের।

বিদ্যালয় পরীক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারের প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রস্তাব করা

হয়েছে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত না আটকানো (No detention) নীতি চালু থাকা উচিত। তবে উচ্চমাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের শিক্ষণ-অর্জন সামর্থ্য (Appropriate Learning Level) সুনিশ্চিত করা দরকার। তৃতীয় শ্রেণী, পঞ্চম শ্রেণী ও অষ্টম শ্রেণীতে State Census Examinatons করা দরকার, যাতে বিদ্যালয় ছুটকে ধরা যায় ও তা রোধ করা যায়। নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীকে একটি পর্যায়ে রেখে প্রতি ছয় মাস অন্তর মোট ৮টি সেমেস্টার (Semester) ব্যবস্থা চালু করার কথা বলা হয়েছে। এটি হবে National Testing Agency- র গাইড লাইন মেনে।

কমিটির প্রস্তাব ৩ কিলোমিটার ব্যাসার্ধে একটি করে বিদ্যালয়গুচ্ছ (School Complex) গড়ে তোলা, যেখানে একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গে সেই এলাকার প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি সংযুক্ত থাকবে। যুক্ত থাকবে অঙ্গনওয়াড়ি ক্ষেত্রগুলি, বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রগুলি, কারিগরি শিক্ষার কেন্দ্রগুলি। বিদ্যালয়গুলিতে মিড-ডে মিল ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে হবে এবং প্রাথমিক স্তরে প্রাতঃরাশের ব্যবস্থা পর্যায়ক্রমে লাগু করতে হবে।

শিক্ষক প্রশিক্ষণের উপর জোর দিয়ে বলা হয়েছে, পৃথক ১ বা ২ বছরের বি এড কর্মসূচীকে পরিবর্তন করে স্নাতকস্তরের তিন বছরের সাথে যুক্ত করে চার বছরের ইন্টিগ্রেটেড বি এড কোর্স চালু করতে হবে। ছাত্র-শিক্ষকের অনুপাত ৩০:১ করতে হবে। ২০৩০ সালের মধ্যে সমস্ত বিদ্যালয় শিক্ষক-শিক্ষিকাকে চার বছরের সুসংহত বি এড পাঠক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

দলিল বলছে স্কুল কমপ্লেক্স ম্যানেজমেন্ট কমিটি এবং স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটিতে অভিভাবকদের রেখে স্কুল পরিচালনায় অন্তত তাদের কিছুটা ক্ষমতা দেবার ব্যবস্থা করা যাবে। কিন্তু দরিদ্র দলিত, আদিবাসী, সংখ্যালঘু অভিভাবকদের কমিটিতে রাখার কোন নির্দিষ্ট ব্যবস্থা উল্লিখিত না হওয়ায় উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, অন্যান্য প্রধান শিক্ষক, প্রভাবশালী অভিভাবক, সমাজসেবী ও প্রাক্তনীদের নিয়ে গঠিত ম্যানেজমেন্ট কমিটিতে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণের সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। যে স্বেচ্ছাসেবী ও কাউন্সিলররা স্কুল কমপ্লেক্সে পড়ুয়াদের সাহায্যার্তে নিযুক্ত হবেন তাঁদের যোগ্যতামান কি হবে, তাঁদের উপস্থিতি শিক্ষকদের ভূমিকাকেও কিছুট খর্ব করবে নাকি— এই প্রশ্নগুলি থাকছে।

স্কুল শিক্ষা ব্যবস্থার ছক পাল্টানোর প্রস্তাব করা হয়েছে (৫+৩+৩+৪)। কিন্তু এতে এক জগাখিচুড়ী অবস্থা তৈরি হবে। অঙ্গনওয়াড়ি ক্ষেত্রগুলি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সাথে সংযুক্তিকরণের প্রস্তাব ২০১৬ সালের খসড়াতেও ছিল। এটা ঠিকই প্রাথমিক বিদ্যালয় চত্বরে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র চললে শিশু শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয় পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন হবে। কিন্তু বর্তমান খসড়াতে একে তিনবছর করে এর সাথে ১ম ও ২য় শ্রেণী যুক্ত করা বাস্তবসম্মত নয়। শহরাঞ্চলের বহু প্রাথমিক বিদ্যালয় অপরিসর ভাড়া বাড়ি বা উচ্চ বিদ্যালয়ের সাথে শেয়ার করে চলে। সেখানে কি হবে? ঐ প্রস্তাব রূপায়িত করার মতো বিপুল অর্থবরাদ্দ কোথা থেকে আসবে। এটা আসলে শিক্ষার বেসরকারীকরণের রাস্তাকে প্রসারিত করবে। মিড-ডে মিলের সাথে প্রাতঃরাশ যুক্ত করার প্রস্তাব নিঃসন্দেহে ভলো। কিন্তু ব্যয় বরাদ্দ ঠিকমতো না হলে কি দাঁড়াবে? বর্তমানে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে খাদ্য ও অর্থের যোগান অপ্রতুল এবং অনিয়মিত। অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের প্রশিক্ষণ ও বেতনক্রম নিয়ে খসড়া দলিল চুপ থেকেছে।

এই দলিলটির ভাষাশিক্ষা নিয়ে বক্তব্য অনেক প্রশ্নের উন্মেষ ঘটায়। হিন্দি ও সংস্কৃতিকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। কোঠারি কমিশন রাজনৈতিক-সামাজিক কারণে প্রবর্তিত ত্রিভাষাসূত্রের থেকে উদ্ভুত সমস্যাগুলির নিরসনে যে প্রস্তাব করেছিল তার মর্মবস্তু থেকেও সরে আসার চেষ্টা হয়েছে এই দলিলে। কোঠারি কমিশন বলেছিল প্রাথমিক স্তরে তিনটি ভাষা শেখানোর প্রচেষ্টায় মাতৃভাষার ওপর দখল ব্যাহত হচ্ছে এবং শিশুর সার্বিক মানসিক বিকাশ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। অন্য ভাষার ব্যবহার ন্যূনতম পর্যায়ে রেখে সবচাইতে গুরুত্ব দেওয়া উচিত মাতৃভাষার ওপর। শিশু ধাপে ধাপে তিনটি ভাষা শিখবে পঞ্চম শ্রেণী থেকে বিভিন্ন পর্বে, তার আগে নয়। বর্তমান দলিল মাতৃভাষার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে অনেক কথা বলেও প্রাথমিক স্তরেই অন্তত তিনটি ভাষার পরিবেশের মধ্যে শিশুকে 'চুবিয়ে' (immerse) রাখবে যাতে প্রথম থেকেই সে সেই বহুভাষিকতা অর্জন করে, যা পরে বিশ্বায়িত দুনিয়ায় তার কাজে লাগবে। তৃতীয় শ্রেণীতে পৌঁছবার আগেই তার এই তিনটি ভাষায় কথা বলতে পারা এবং প্রাথমিক স্তরের বই পড়তে পারা চাই। তৃতীয় শ্রেণী থেকে অন্য দুটি ভাষায় সে লিখতেও শুরু করবে।

সব শিক্ষাবিদই বলেন, একাধিক ভাষা আত্মস্থ করার প্রক্রিয়া কথা বলতে শেখার পরে ১০-১১ বছর বয়স হওয়া পর্যন্ত চলতে পারে একমাত্র যদি মাতৃভাষা ছাড়াও অন্য ভাষার ব্যাপক উপস্থিতি শিশুর স্বাভাবিক পরিবেশে থাকে। লক্ষ লক্ষ শিশু যারা নিজেদের বাড়িতে ও সামাজিক পরিবেশে মাতৃভাষা ছাড়া আর কিছুই শোনে না, তাদের প্রাক-প্রাথমিক স্তর থেকে স্কুলে একটি কৃত্রিম ভাষা-পরিবেশ তৈরি করে তিনটি ভাষার মধ্যে 'চুবিয়ে' রাখলেই তারা তাতে পরবর্তী জীবনে ব্যবহার করার মতো দক্ষতা অর্জন করে ফেলবে এ চিন্তা সবরকম বিজ্ঞানসম্মত ভাষাতত্ত্বের বিরোধী।

বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে আরো কিছু প্রস্তাব করা হয়েছে। যেমন, ২০২২ সালের মধ্যে সমস্ত বিদ্যালয়গুলিকে বিদ্যুতায়ন করে কম্পিউটার এবং ইন্টারনেট সংযোগের ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়াও উপযুক্ত পরিকাঠামো, নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা, শৌচাগার, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গড়ে তোলা ইত্যাদি। কিন্তু এই বিশাল কর্মকাণ্ডের অর্থসংস্থানের কোন সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব নেই।

বিদ্যালয়স্তরে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক একীভূত করে NTA গাইড লাইন মেনে সেমেস্টার সিস্টেম লাগু করা, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের বোর্ড পরীক্ষা তুলে দেওয়া আখেরে সরকারী ব্যবস্থাপনার বিদ্যালয়গুলিকে আরো দুরবস্থার মধ্যে ফেলবে। শিক্ষাপ্রসারে এগুলি আস্থা হারাবে এবং বিদ্যালয় স্তরে শিক্ষাকে শিক্ষা ব্যবসায়ীরা তাদের লুঠের ক্ষেত্র হিসাবে ব্যবহার করবে। প্যারাটিচার পদের বিলোপ ঘটিয়ে সব শিক্ষকদের এক বেতনক্রমের কথা বলা হয়েছে। সেই বেতনক্রমের ভিত্তি কি হবে, দেশজুড়ে এক হবে নাকি রাজ্যগতভাবে নির্ধারিত হবে— এই বিষয়গুলিতে ধোঁয়াশা রয়ে গেছে। অপরদিকে প্রস্তাবে কম বেতনের শিক্ষা সহায়ক গড়ে তোলার প্রস্তাব করা হয়েছে। তাদের কার্যধারা সম্পর্কে কিছু বলা নেই।

মুনাফার জন্য নয় এমন বেসরকারী স্কুলগুলির ওপর শিক্ষার অধিকার আইনের বিধিনিষেধ শিথিল করার কথা বলা হয়েছে। ঐগুলিকে সমাজ সেবামূলক, বৈচিত্র্যের বাহক বলে অভিহিত করা হয়েছে কিন্তু বাস্তবচিত্র কি বলে? বেসরকারী স্কুলগুলির অধিকাংশই মুনাফার জন্য গড়ে উঠেছে। আসলে এর মধ্য দিয়ে শিক্ষার বাণিজ্যিকিকরণের পথকেই প্রশস্ত করতে চাওয়া হয়েছে। এদেরকে ইচ্ছেমতো ফি নেবার অধিকারও দেওয়া হয়েছে।

ধর্মীয় সংস্থাগুলিকে শিক্ষাক্ষেত্রে আরও বিনিয়োগ করতে এবং বিদ্যালয় পরিচালনায় উৎসাহিত করতে চাওয়ার মধ্য দিয়ে সরকার-পোষিত শিক্ষার ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র বিপন্ন হবে।

উচ্চশিক্ষা

কমিটির মতে উচ্চশিক্ষার ওপর সর্বভারতীয় সমীক্ষা অনুযায়ী দেশে উচ্চশিক্ষায় ভর্তির হার ২০১১-১২-তে ছিল ২০.৮ শতাংশ। ২০১৭-১৮-তে তা বেড়ে হয়েছে ২৫.৮ শতাংশ। উচ্চশিক্ষায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে ২০১৬ সালের ভারত সরকারের Education Statistics অনুযায়ী প্রতি ১০০ জনে ভারতে হার ছিল ২৩, চীনে ৩৯.৪, আমেরিকায় ৮৬.৭ এবং জার্মানীতে ৬৫.৫। কমিটির মতে এই কম হারের কারণ হলো উচ্চশিক্ষায় সুযোগের অভাবে। কমিটির প্রস্তাব বর্তমান গড় ভর্তি হারকে

▶▶ চতুর্থ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

সম্পাদকীয়

মেরি আঁতোয়ানেৎ ও তাঁর আধুনিক উত্তরসূরীগণ

রোম নগরী যখন আগুনে পুড়ছিল, সম্রাট নিরো তখন নির্লিপ্ত ভঙ্গীমায় বেহালা বাজাচ্ছিলেন–এমনটাই জনশ্রুতি। অথবা এমনও হতে পারে, তিনি ঐ বহ্ণুৎসব উপভোগ করছিলেন। কোন্‌টা ঠিক, তা যাচাই করার কোন সুযোগ নেই, কারণ জনশ্রুতির দিনক্ষণ ইতিহাসে লিপিবদ্ধ থাকে না। তবে এটাও ঠিক, জনশ্রুতির কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি না থাকলেও, তা সমকালীন আর্থ-সামাজিক বাস্তবতার চিত্র তুলে ধরে। তাই ইতিহাসের খাতায় সম্রাট নিরোকে না খুঁজে বরং বোঝা দরকার, রাজতান্ত্রিক শাসনে শাসক ও শাসিতের দুস্তর ব্যবধানের ঐতিহাসিক বাস্তবতাটিকে। অবশ্য তৎকালীন ঐতিহাসিক বাস্তবতাকে নিরীক্ষণ ও উপলব্ধি করার জন্য শুধুমাত্র জনশ্রুতির ওপর নির্ভর করতে হবে তা নয়। ইতিহাসের পাতা ওল্টালেও এমন চরিত্রের সন্ধান মিলবে। ফরাসী সম্রাজ্ঞী মেরী আঁতোয়ানেৎ একবার তাঁর সাম্রাজ্যের প্রজাকুল অনাহার ক্লিষ্টি জানতে পেরে মন্তব্য করে ছিলেন, ‘ওদের যদি রুটি না জোটে, তাহলে কেক খেতে পারে।’

এই পর্যন্ত পাঠ করে পাঠক বন্ধুদের মনে হতে পারে, হঠাৎ করে রাজতন্ত্রের প্রতিভূদের নিয়ে টানাটানি কেন? আমরা তো, কয়েক শতাব্দী পেরিয়ে, আধুনিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে বাস করছি। আসলে গণতন্ত্রে বাস করেও রাজতান্ত্রিক ইতিহাস বা আখ্যানের কথা মনে পড়ে যাওয়ার কারণই হল, মহান কার্ল মার্কসের সেই অমোঘ উক্তি ‘‘History repeats itself, but not in the same way!’’ ভিন্ন বাস্তবতায়, ভিন্ন প্রক্রিয়ায় ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে। তাই রাজতন্ত্রের মেরি আঁতোয়ানেৎ ভিন্ন চেহারায়, ভিন্ন পোশাকে আধুনিক গণতন্ত্রে আবির্ভূত হন। যিনি আর্থ-সামাজিক বাস্তবতাকে বুঝেও না বোঝার, এড়িয়ে যাওয়ার ভান করেন। ফরাসী সম্রাজ্ঞী রুটির বদলে কেক খাওয়ার যে সু (?!) পরামর্শটি দিয়েছিলেন, তা ছিল প্রাক বিপ্লব সঙ্কট জর্জরিত ফরাসী অর্থনীতির অন্ধকারাচ্ছন্ন দিকটিকে আড়াল করার জন্যই।

আজও বিশ্ব অর্থনীতি যখন গভীর সঙ্কটে, যখন ঝাঁ-চকচকে পোশাক পরিহিত নয়া উদারবাদী অর্থনীতির ভেতরের কঙ্কালসার চেহারাটা বেড়িয়ে পড়েছে, তখন বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে জনগণকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য বিভিন্ন চেহারার মেরী আঁতোয়ানেৎ অথবা সম্রাট নিরোকে দেখা যাচ্ছে। এরা অবশ্য রুটির বদলে কেক নয়, রুটির বদলে কোথাও ধর্ম, কোথাও জাত-পাত, কোথাও অভিবাসী, আবার কোথাও যুদ্ধের জুজু দেখাচ্ছেন। কেউ আবার বেহালা না বাজালেও হাতে ঝাঁটা নিয়ে সাফাই অভিযানে নামছেন। পৃথিবীর স্ব-ঘোষিত অভিভাবক রাষ্ট্রটির মাথায় যিনি বসে আছেন, তিনি এমনই এক আধুনিক আঁতোয়ানেৎ।

তবে ভারতবাসী এবং পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী হিসেবে আমাদের বাড়তি সুবিধা বা অসুবিধা হল, হাতের কাছেই এমন দু’জন কর্ণধার রয়েছেন, যাঁরা আঁতোয়ানেৎ সুলভ চারিত্রিক গুণাবলী বিশিষ্ট। দু’জনেই দেশ ও দেশের বহুবিধ সমস্যাবলী সম্পর্কে চূড়ান্ত নির্লিপ্ত এবং এগুলিকে উপেক্ষা করে অবান্তর বিষয়ে কথা বলতে ভালবাসেন। অবশ্য এই সব কিছুই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং কৌশল প্রসূত— মূল সমস্যাকে আড়াল করে, অন্যান্য কিছু অপ্রয়োজনীয়, কম প্রয়োজনীয় বা ক্ষতিকর বিষয়কে সামনে নিয়ে এসে এমন এক পরিমণ্ডল গড়ে তোলা যা জনচেতনাকে প্রভাবিত করে। এমনকি এই প্রভাবের মাত্রা, কখনও কখনও, এমন উচ্চতায় পৌঁছায় যে তা, জনসাধারণকে ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণেও প্ররোচিত করে। এই ধরনের পরিকল্পনা ও প্রবণতার এক পোশাকি নামও দেওয়া হয়েছে—‘পোস্ট ট্রুথ’ বা উত্তর সত্য। যা সত্য নয় তাকেই সত্য হিসেবে নির্মান, বা যা জরুরি নয়, তাকেই সর্বাধিক জরুরী বিষয় হিসেবে জনমানসে প্রতিফলন ঘটানোই হল উত্তর-সত্য।

মেরী আঁতোয়ানেৎ-এর আল-টপকা মন্তব্যে তাঁর রাজসভায় বা প্রজাসাধারণের মধ্যে কি ধরনের প্রতিক্রিয়া ঘটেছিল, তা জানা যায় না। জানার কোন সুযোগও নেই। কিন্তু এটুকু বলা যায় যে, প্রজা সাধারণের জীবন যন্ত্রণা সম্পর্কে সম্পূর্ণ উপেক্ষার মনোভাব থেকেই তিনি ঐ ধরনের মন্তব্য করেছিলেন। এর বাইরে অন্য কোন তাগিদ তাঁর ছিল না বলেই ধরা যায়। কারণ তিনি ছিলেন রাজতন্ত্রের প্রতিনিধি। আধুনিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মতন বারংবার নির্বাচিত হওয়ায় ঝঞ্ঝাট তাঁর ছিল না। কিন্তু যাঁরা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অংশগ্রহণকারী আধুনিক বা আধুনিকা আঁতোয়ানেৎ, ফের নির্বাচিত হওয়া ও তার ভিত্তিতে ক্ষমতা কুক্ষিগত করার তাগিদ তাঁদের থাকেই। তাই তাঁরা যা বলেন, ভেবে-চিন্তেই বলেন— কোন আল-টপকা মন্তব্য করেন না। এই প্রসঙ্গে, যেমন আগেই বলা হয়েছে, আমাদের দেশের বর্তমান কর্ণধার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হতে পারেন। এই মুহূর্তে দেশের মানুষের সামনে যে সমস্যাগুলি খুব বড় আকারে দেখা দিয়েছে, লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, সেগুলি নিয়ে তাঁর মুখে কোন কথা শোনা যায় না। দেশের অর্থনীতি গভীর সংকটে, উৎপাদনমূলক সমস্ত ধরনের কর্মকাণ্ডের গতি শ্লথতর হচ্ছে, ব্যাপক বেকারী, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি, চাহিদার অভাবে আর্থিক লেন-দেনে মন্দার প্রকোপ, ছোট-বড় সমস্ত ধরনের কলকারখানায় ছাঁটাই চলছে নির্বিচারে। অথচ এই সমস্যাগুলির কারণ ও তার সমাধানে সরকারী পরিকল্পনা ইত্যাদি বিষয়ে দেশের নির্বাচিত কর্ণধার স্পিকটি-নট। তাঁর সরকারী বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা, রাজনৈতিক সভা-সমাবেশে ভাষণ বা বেতারে মন কি বাত শুনলে মনেই হবে না এই সমস্যাগুলির আদৌ অস্তিত্ব রয়েছে। আবার যা আরও উল্লেখযোগ্য তা হল, তিনি যে শুধু মূল সমস্যাকে এড়িয়ে যান তা-ই নয়। এমনকি একটা বিপরীত চিত্র তৈরী করার চেষ্টা করেন। যেমন, দেশের অভূতপূর্ব উন্নয়ন ঘটছে, উন্নয়নের এই গতি অতীতে কখনও ছিল না, সাহসী সংস্কারের পদক্ষেপ গ্রহণ করার ফলে আমাদের দেশ আজ বিশ্বের আঙিনায় অতিরিক্ত কদর পাচ্ছে ইত্যাদি। প্রশ্ন উঠতে পারে, যা বাস্তব, তার বিপরীত চিত্র হাজির করা হলেও সাধারণ মানুষ কি তা গ্রহণ করছেন? এর উত্তরে এক কথায় না বলা যাবে না। একেবারে নির্জলা মিথ্যার নির্মাণ, যার পোশাকি নাম ‘পোস্ট ট্রুথ’ সবাই না হলেও, কিছু মানুষতো গ্রহণ করছেনই। কিন্তু কেন? উত্তরটা লুকিয়ে রয়েছে, নয়া উদারবাদী অর্থনীতির ভিত্তির ওপর নির্মিত সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের মধ্যেই। এই পরিমণ্ডলের অভ্যন্তরে সর্বদাই খেলা করে এক ‘বিচ্ছিন্নতা’র বাতাস। যেখানে একক মানুষকে তার যাবতীয় সমস্যা, সম্ভাবনা, প্রতিকার ইত্যাদি বিষয়ে এককভাবেই ভাবতে শেখায়। সামাজিক দৃষ্টি কিছুটা ঝাপসা হয়ে যায়। ফলে কোন এক বিস্কুট কোম্পানী থেকে ছাঁটাই হওয়া শ্রমিকও, দেশের কর্ণধারের ‘মন কি বাত’ শুনে মনে করেন, “তিনি যা বলছেন তা হয়ত ঠিক (দেশের অগ্রগতি ঘটছে), আমার দুর্ভাগ্য যে সেই সুফলের ভাগীদার আমি হতে পারছি না।” ‘পোস্ট ট্রুথ’ কে বিশ্বাস যোগ্য করার প্রশ্নে নয়া উদারবাদের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল যদি জমি হয়, তাহলে তাতে সার ও জল দিয়ে সেই জমিকে পুষ্ট করছে আধুনিক বিপুল শক্তিশালী প্রচার মাধ্যম। যা মেরী আঁতোয়ানেৎ-এর হাতে ছিল না। রাজচন্দ্র ও গণতন্ত্রের এও এক মজার পার্থক্য। রাজতন্ত্রে রাজা বা রানী যা বলতেন তা ছিল স্পষ্ট। মুখোশ বিহীন। প্রজা সাধারণ সহজেই বুঝতেন, যে শাসক শাসকের স্বার্থেই কথা বলছে। কিন্তু প্রতিবাদ করার সুযোগ কার্যত ছিল না। তখন প্রতিবাদ বলতে বোঝাত একমাত্র জোটবদ্ধ বিদ্রোহ। যা দৈনন্দিন ঘটনা ছিল না। এখন শাসক যা বলেন, তা শুনে মনে হয় শাসিতের স্বার্থে বলছেন। কিন্তু আসলে তা নয়, আবার এখন প্রতিবাদ করার আইনী সুযোগও রয়েছে। কিন্তু বহুক্ষেত্রে প্রতিবাদ করার প্রয়োজনটাই অনেকে বুঝতে পারছেন না। বা অনেকটা সময় পেরিয়ে বুঝতে পারছেন। যখন অনেকটাই ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে। আর্থিক পরিস্থিতির মতই, সামাজিক ক্ষেত্রেও একই প্রবণতার প্রতিফলন দেখা যাবে। দলিত ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর যে সমস্ত ঘৃন্য আক্রমণ সংগঠিত হচ্ছে, যারা এই কাজ করছে তাদের রাজনৈতিক পরিচয় স্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও, দেশের কর্ণধার আজ পর্যন্ত তাদের নিন্দা করে একটি শব্দও খরচা করেননি। দলিত ও সংখ্যালঘুদের হত্যা করার পরেও, যারা প্রকাশ্য দিবালোকে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থা গ্রহণের কোন নির্দেশ, তাঁর কণ্ঠ থেকে নিঃসৃত হচ্ছে না। চলছে পোস্ট ট্রুথের নির্মাণ। যারা হত্যাকারী, তাদেরই দেশপ্রেমিকের চেহারায় হাজির করা হচ্ছে। অথচ সাধারণ মানুষের মধ্যে তেমন ক্ষোভ কোথায়?

এমনকি মহাত্মা গান্ধীও আজ এই প্রচারের বাইরে নেই। গান্ধীজীর হত্যাকারীরাই আজ নির্দ্বিধায় গান্ধীজীকে ব্যবহার করছে, তাদের সরকারী-বেসরকারী বিভিন্ন কর্মসূচী ও প্রচারের ‘লোগো হিসেবে’

দেশের কর্ণধারের মতই, আমাদের রাজ্যের কর্ণধারও ‘পোস্ট ট্রুথ’ প্রচারের প্রতিভূ। রাজ্যের অর্থনীতির বেহাল দশা। সামাজিক অস্থিরতা, মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারের ওপর আক্রমণ, ইত্যাদি জনসাধারণ কেন্দ্রীক কোনে বিষয়েই তাঁর ভাবান্তর হয় না। অর্থনীতির বিভিন্ন সূচকের ভিত্তিতে রাজ্যের প্রকৃত অবস্থা, আর সরকারী প্রচারের মধ্যে কোন তাল-মিল নেই। এমন কি বেতন কমিশনকে নিয়েও যেভাবে তিনি কয়েকটি কথা বললেন, তাতে মনে হয়, তাঁর মহানুভবতার জন্যই কর্মচারীদের বেতন সংশোধিত হচ্ছে। এখানে কর্মচারীদের অধিকার, প্রয়োজন ইত্যাদি বিষয়গুলি যেন অবান্তর কোন বিষয়। কেন্দ্র ও রাজ্যের কর্ণধারদের প্রচার ভঙ্গীমা কার্যত একই রকম হলেও, দু’জনে যেহেতু দুটি পৃথক রাজনৈতিক গোষ্ঠীর প্রতিনিধি, তাই গণতন্ত্রের বাধ্যবাধকতায় কখনও মেকী লড়াই-এ অবতীর্ণ হতে হয়। যা দেখা গিয়েছিল গত লোকসভা নির্বাচনের সময়।

এই দুই শাসকের শাসনকাল প্রায় একই। প্রচার ভঙ্গীমাও অনুরূপ। কিন্তু একটি গুরুতর পার্থক্যও রয়েছে। পার্থক্যটি হল—রাজ্যের শাসক যা কিছু করেন, তা শুধু তাৎক্ষণিক লাভের আশায়। অর্থাৎ ক্ষমতায় থাকার জন্য। কেন্দ্রের শাসকের কিন্তু তাৎক্ষণিক লাভের পাশাপাশি, একটি দূর প্রসারী লক্ষ্যও রয়েছে। লক্ষ্যটি হল এদেশের বুকে একটি হিন্দু রাষ্ট্র গড়ে তোলা। সুতরাং এই উভয় শক্তির তথাকথিত উপেক্ষার মনোভাবের পিছনে যে রাজনীতি, তাকে অনুধাবন করে যোগ্য জবাব দেওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করা দরকার। ❑

২৩ অক্টোবর, ২০১৯

সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সভা

গত ১৪-১৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সভা পাঞ্জাব রাজ্যের জলন্ধরে দেশ ভগৎ ইয়াদগার হলে সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়। পাঞ্জাব সাব-অর্ডিনেট সার্ভিস ফেডারেশনের (এফিলিয়েট) উদ্যোগে গুরুত্বপূর্ণ সভার প্রাক্কালে কয়েক হাজার কর্মচারীর মিছিল ও প্রকাশ্য অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। শ্রমিক কর্মচারী ও অন্যান্য সংগঠনগুলির নেতৃত্ব এবং সাধারণ সম্পাদক এ. শ্রীকুমার প্রকাশ্য অধিবেশনে বক্তব্য রাখেন। প্রকাশ্য অধিবেশনে কর্মচারীদের জমায়েত ও বিশেষ করে মহিলাদের জমায়েত সারা দেশের সর্বভারতীয় নেতৃত্বকে দারুণভাবে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করেছে

সভার শুরুর প্রারম্ভে সংগঠনের অনারারি চেয়ারম্যান প্রয়াত শ্রদ্ধেয় অজয় মুখোপাধ্যায়ের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে নীরবতা পালন করা হয়। এছাড়া প্রয়াত কমরেড তুলসী দস্তিদারসহ অন্যান্য রাজ্যের প্রয়াত নেতৃত্বসহ যারা এই সময়কালে শহীদ হয়েছেন তাদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জন্মানো হয়।

পরবর্তীতে অভ্যর্থনা কমিটির পক্ষে পাঞ্জাব রাজ্যের প্রবীণ প্রাক্তন সর্বভারতীয় নেতা কমরেড বেদ প্রসাদ সভায় অভ্যর্থনা জানিয়ে বক্তব্য রাখেন। পরে সাধারণ সম্পাদক এ. শ্রীকুমার প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন। তিনি সারা বিশ্বে ও দেশের পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে সাংগঠনিক দায়িত্ব ও কর্তব্য বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন দেশের চরম দক্ষিণপন্থী সাম্প্রদায়িক শক্তির স্বেরাচারী পদক্ষেপ যা ফ্যাসিস্টসুলভ আচরণের প্রতিধ্বনি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যা দেশের পক্ষে ভয়ংকর। কাশ্মীর ইস্যুসহ একাধিক ঘটনা উল্লেখ করেন এবং বলেন দেশের ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র সংবিধান আজ আক্রান্ত তাই সব রাজ্যের দেশের জন্য ঐক্য ও সংহতি রক্ষায় উপযুক্ত ভূমিকা পালন করার লক্ষ্যে সর্বত্র প্রস্তুতি নিতে বলেন। মানুষের জীবন জীবিকা আরো আক্রান্ত হচ্ছে। আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৯ সর্বভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন ও ফেডারেশনগুলির আহ্বানে দিল্লীর পার্লামেন্ট স্ট্রীট গণ কনভেনশন অনুষ্ঠিত হবে। সর্বভারতীয় সংগঠন হিসাবে আমাদের উপস্থিত থাকতে হবে। এরপর তিনি সাংগঠনিক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় উল্লেখ করেন।

পরে ১৫টি রাজ্য থেকে মহিলা সেশনে ১০ জন মহিলাসহ সাধারণ সম্পাদকের প্রস্তাবনার উপর মোট ২৫ জন আলোচনা করেন। পশ্চিমবঙ্গ থেকে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী ও সুতপা হাজরা। এছাড়া আমাদের রাজ্য থেকে বিজয় শঙ্কর সিংহ সভায় উপস্থিত ছিলেন। এরপর জবাবী বক্তব্য রাখেন এ. শ্রীকুমার। সভা পরিচালনা করেন চেয়ারম্যান এস. লাম্বা।

এই সভা থেকে নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়—

(১) আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৯ দিল্লীর পার্লামেন্ট স্ট্রিটে গণ কনভেনশন চূড়ান্ত হবে। সব রাজ্য থেকে উপস্থিত থাকতে হবে।

(২) আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ হেড কোয়ার্টার বিল্ডিং তৈরির লক্ষ্যে প্রস্তুতি ছাড়াও হবে।

(৩) ২৮-৩০ ডিসেম্বর ২০১৯ জাতীয় ন্যাশনাল কাউন্সিল সভা মহারাষ্ট্রের পুণেতে অনুষ্ঠিত হবে।

(৪) সর্বভারতীয় নেতৃত্বের উপস্থিতিতে সব রাজ্যে কমিটি সভাসহ কনভেনশন অনুষ্ঠিত হবে।

(৫) দেশের ঐক্য ও সংহতির বিপদ, নয়া পেনশন ব্যবস্থা (NPS) বাতিল, চুক্তি কথায় কর্মচারীদের সম কাজে সম বেতন ও নিয়মিত কর্মচারীদের মতো সুযোগ সুবিধা প্রদান ও শুন্যপদ পুরণের দাবিতে রাজ্যে রাজ্যে কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে।

(৬) গৃহ নির্মাণের লক্ষ্যে তহবিল সংগ্রহ অভিযানে যে সব রাজ্যে এখনও দেয়নি সেই সব রাজ্য গুলির আরো সক্রিয় উদ্যোগ নিতে হবে।

(৭) সদস্য চাঁদা ২ টাকা হারে ও এফিলিয়েশন ফি দ্রুততার সাথে জমা দিতে হবে।

(৮) এমপ্লয়িজ ফোরাম-এর গ্রাহক বৃদ্ধিসহ বকেয়া অর্থ জমা দিতে হবে।

(৯)পরবর্তী কার্যনির্বাহী কমিটির সভা ৩-৪ এপ্রিল ২০২০ অন্ধ্রপ্রদেশের ত্রিপুতিতে অনুষ্ঠিত হবে। ❑

শোক সংবাদ

কমরেড অরুণ মণ্ডল

রাইটার্স বিল্ডিংস গ্রুপ ডি কর্মচারী সমিতির কার্যকরী কমিটির সদস্য ও সংগ্রামী হাতিয়ার পত্রিকার ম্যানেজেরিয়াল টিমের সদস্য কমরেড অরুণ মণ্ডল গত ২২ অক্টোবর রাত ১.৫০ মিনিটে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭১ বছর। তাঁর স্ত্রী, এক পুত্র ও তিন কন্যা বর্তমান। কম. অরুণ মণ্ডল ১৯৬৬ সালে মাত্র ১৮ বছর বয়সে মহাকরণে গ্রুপ ডি পদে যোগদান করেন। কর্মজীবনের শুরু থেকেই তিনি কর্মচারী আন্দোলনের সাথে নিজেকে যুক্ত করেন এবং রাইটার্স বিল্ডিং গ্রুপ ডি সমিতি এবং রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সক্রিয় কর্মীতে পরিণত হন। ২০০৮ সালে অবসরগ্রহণ করার পরেও কর্মচারী আন্দোলনের সাথে তাঁর দৈনন্দিন যোগাযোগ ছিল। প্রগতিশীল পুস্তক ও পত্রপত্রিকায় কর্মী সংগঠকদের কাছে পৌঁছে দেবার ক্ষেত্রে কম. মণ্ডল নিরলস ভূমিকা পালন করতেন। ❑

দ্বাদশ পৃষ্ঠার পর

শারদ সমন্বয়

মেয়র, বিশিষ্ট আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য। তিনি তাঁর বক্তব্যের শুরুতেই বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ নোয়াম চমস্কির উদ্ধৃতি উল্লেখ করে বলেন, সারা বিশ্বজুড়ে চলছে কর্পোরেটক্রেসি, ডেমোক্রেসি নয়। আমরা আমাদের কথা ঠিক মত পৌঁছতে পারছি না। গণতন্ত্রের মূল কথা ভিন্ন ভিন্ন মত ভিন্ন ভিন্ন মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং তার মধ্যে দিয়ে নতুন পরিমণ্ডল গড়ে তোলা। আমাদের স্বাধীন মতামত নিয়ন্ত্রিত হয়ে যাচ্ছে। গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ হিসাবে প্রচার মাধ্যম একপেশে ভূমিকা পালন করছে ফলে সত্যা-সত্য জানা যাচ্ছে না। সারা বিশ্বজুড়ে একই ট্রেন্ড। কর্পোরেট পুঁজি সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে মিডিয়া হাউসগুলিকে, সেক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে সমন্বয়ের মতন পত্রিকা সমাজের প্রকৃত কথা তুলে ধরার মতন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা প্রতিপালন করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন, বহু সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করেন আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে সরকারী কর্মচারীদের মধ্য দিয়ে। সে কারণে অতীতে বা বর্তমানে বহু সাধারণ মানুষ ভয়ভীতিকে তুচ্ছ করে সরকারী-কর্মচারীদের সাহায্য করে গেছেন। কিন্তু দুঃখের হলেও সত্য অতীতের থেকে বর্তমানে সেই অংশ কমছে। বর্তমানে বৃহদংশের মানুষ সামগ্রিকতার চিন্তার বাইরে গিয়ে ব্যক্তিগত পরিসরের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। তাদের চিন্তার সীমা সীমায়িত হয়ে পড়ছে চার দেওয়ালের গণ্ডির মধ্যে। এর মধ্যে দিয়ে তাদের মধ্যে হতাশা, অন্যায়ের কাছে আত্মসর্মপণ করার প্রবণতা জন্মাচ্ছে। এন আর সি প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি বলেন, এন আর সি-র নামে মানুষের মধ্যে অযথা আতঙ্ক তৈরি করা হচ্ছে। মানুষের মধ্যে আস্থা আনা প্রয়োজন যে নাগরিকত্ব জন্মগত অধিকার, এটি সরকারী প্রশাসনের আমলাদের উপর নির্ভর করেনা। এটি নির্ভর করে সাংবিধানিক অধিকারের মধ্যে। তিনি তাঁর বক্তব্যে আরও উল্লেখ করেন সংসদীয় গণতন্ত্র আজ আক্রান্ত। আক্রান্ত আমাদের সংবিধান, আক্রান্ত আমাদের বুদ্ধির জগৎ। ভারতবর্ষব্যাপী বিজ্ঞান বিরোধিতার এক অপচেষ্টা চালানো হচ্ছে, উৎসাহিত করা হচ্ছে অপবিজ্ঞান, কু-সংস্কারকে। পুরাণকে বিজ্ঞান-ভিত্তি দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতেই হবে এবং সেক্ষেত্রে সমন্বয় তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা প্রতিপালন করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

এদিনের এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিজয় শঙ্কর সিংহ। তিনি তাঁর বক্তব্যের শুরুতেই উল্লেখ করেন যে গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ হিসাবে মিডিয়া তার ভূমিকা পালন করছে না। ফলত গণতন্ত্র আজ বিপর্যস্ত। বিকল্প নীতির কথা যারা বলে তাদের ব্ল্যাক আউট করা হচ্ছে। এরকম পরিস্থিতির মধ্যে আমাদের সংগঠনগুলির যে পত্রিকাগুলি আছে তাদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। তাকে আরো আরো বেশী শক্তিশালী করতে হবে। ৩৫ বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে শারদ সমন্বয় প্রকাশ করার জন্য তিনি সংগঠকদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির অষ্টম সম্মেলনের ঘোষণা ছিল—'দুনিয়াজোড়া শ্রেণী দ্বন্দ্বে আমরা নিরপেক্ষ নই আমরা সমাজতন্ত্রের পক্ষে। সেই রেশ ধরেই বিকল্পের সন্ধানে সংগঠন হেঁটে চলেছে। পুঁজিবাদের অভ্যন্তরীণ সমস্যার জন্য চরম দক্ষিণপন্থী শক্তির জন্ম হয়েছে, যারা শেষ কথা বলবে না। এ প্রসঙ্গে তিনি ১৯৩০-এর মহামন্দায় ফ্যাসিস্ট শক্তির উত্থান এবং তার বিনাশের কথা উল্লেখ করেন। তিনি ভারতবর্ষের কথা উল্লেখ করে বলেন গত ৪৫ বছরে দেশে বেকারীর হার সর্বোচ্চ। ধর্মের নামে, জাতের নামে, বর্ণের নামে বিভাজন চলছে। কর্পোরেটরা লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা ঋণ ছাড় পাচ্ছে অথচ কৃষক ফসলের দাম না পেয়ে আত্মহননের পথ বেছে নিতে বাধ্য হচ্ছে। দেশকে স্বৈরতন্ত্রের দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। আয়ের বৈষম্য বাড়ছে মারাত্মকভাবে। সেখানে দাড়িয়ে শ্রমজীবী মানুষকে আরো ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। আগামীদিনে বৃহত্তর সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে সারা দেশকে স্তব্ধ করে দেওয়ার আহ্বান রেখে তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

এই সভায় বক্তব্য উপস্থাপিত করতে গিয়ে সমন্বয়ের সম্পাদক মনোজ রক্ষিত বলেন, যারা মূল্যবান লেখা দিয়ে শারদ সমন্বয়কে সমৃদ্ধ করেছেন তারা অভিন্দনযোগ্য। তিনি অভিনন্দন জানান ১৬ বছর বয়সী গ্রেটা থুন বার্গকে যার জলবায়ু-সঙ্কটের আন্দোলন সারা বিশ্বকে আন্দোলিত করেছে। এক ভয়ঙ্কর সময়ের মধ্যে থাকার উল্লেখ করে তিনি বলেন, পুঁজির নগ্নতা, হিংস্রতা এতটাই বৃদ্ধি পেয়েছে যে সে তার মুনাফার জন্য ভবিষ্যত সমাজ সভ্যতাকে অস্বীকার করে আমাজনের মাটির তলার তৈলভাণ্ডার খনিজ পাওয়ার লক্ষ্যে পৃথিবীর ২০ ভাগ সরবরাহকারী অক্সিজেন ভাণ্ডারকে নির্দ্ধিধায় ধ্বংস করছে। তাই সারা পৃথিবী জুড়ে চরম দক্ষিণপন্থী শক্তির আক্রমণের লক্ষ্য হয়েছে শ্রমজীবী মানুষ। যেহেতু দেশে দেশে পুঁজির আগ্রাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করছে একমাত্র শ্রমজীবীরা। আর এই শ্রমজীবী অংশের ঐক্যকে ভাঙতে কোথাও জাতীয়তাবাদের নামেন কোথাও ধর্মের নামে বিভাজিত করে দেওয়া হচ্ছে। তাই সুস্থ স্বাভাবিক সামাজিক পরিমণ্ডল গড়ে তোলার লক্ষ্যে পুঁজির আগ্রাসনের বিরুদ্ধে শ্রমজীবী মানুষের অর্জিত অধীকার রক্ষাসহ নতুন নতুন আক্রমণ মোকাবিলা করার জন্য সমন্বয় তার যথাযথ দায়িত্ব পালন করবে।

সভার শুরুতে পারম্ভিক বক্তব্য উপস্থিত করেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক সুখেন কুন্ডু। তিনি সংক্ষিপ্ত ভাবে শারদ সমন্বয় যে ভূমিকা পালন করে আসছে তা উল্লেখ করে আরও ব্যাপকতায় এর প্রচার নিয়ে যাওয়ার জন্য আহ্বান জানান। □

দ্বাদশ পৃষ্ঠার পর

প্রতিষ্ঠা দিবস এর কর্মসূচী

কর্মচারীদের সংগঠনগুলির যৌথ সংগ্রামের মঞ্চ রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি। রাজ্য সরকারী কর্মচারী আন্দোলনের ইতিহাসে যুক্ত হল নতুন অধ্যায়। সংগ্রামের ক্ষেত্রে ঘটল রূপান্তর। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির জন্মলগ্ন থেকে অন্যতম শরিক হয়ে নিজস্ব দাবী দাওয়া নিয়ে আন্দোলনের পাশাপাশি যৌথ আন্দোলনেও কর্মচারীদের সামিল করেছে, বর্তমানের আক্রমনের মুখে দাঁড়িয়েও আমাদের প্রিয় সমিতির সদস্যবন্ধুরা রাজ্যের প্রত্যন্ত ব্লকগুলোতে লড়াই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। সংগঠনের কাজের পরিধি বৃদ্ধি ও জনপ্রিয়তা বেড়ে যাওয়ার কারণে ১৯৫৭ সালে সংগঠনের নাম পরিবর্তন করে নতুন নাম দেওয়া হল কৃষি কারিগরী কর্মী সংস্থা। জন্মলগ্ন থেকেই লড়াই আন্দোলনের পথ বেয়ে আমাদের প্রিয় সমিতি আজ শতবর্ষের দিকে এগিয়ে চলেছে।

প্রতিষ্ঠা দিবসের প্রধান অতিথি রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য তথা সংগঠনের মুখপাত্র সংগ্রামী হাতিয়ার পত্রিকার সম্পাদক সুমিত ভট্টাচার্য্য তার আলোচনার শুরুতেই সমিতিকে অভিনন্দন জানান জন্মলগ্ন থেকেই রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির অন্তর্ভুক্ত সমিতি হিসাবে লড়াই আন্দোলনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা প্রতিপালনের জন্য। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির দীর্ঘ লড়াই আন্দোলনের সুমহান ঐতিহ্যের বিষয় স্মরণ করিয়ে তিনি বলেন সারা দেশে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস চলছে। দেশের আর্থিক অবস্থার প্রকৃত চিত্র তুলে ধরে তিনি বলেন সরকারী নীতির কারনেই ধনী দরিদ্রের মধ্যে বৈষম্য বাড়ছে। ফলে ক্রমশ দুর্দশাগ্রস্থ হয়ে পড়ছে গোটা দেশ। একে আড়াল করতে, সাধারণ মানুষের মনঃসংযোগ অনত্র সরিয়ে নিতে এন আর সি সহ আরও নিত্য নতুন ব্যবস্থা নিয়ে আসছে দেশের বর্তমান সরকার। মানুযে মানুযে বিভেদ তৈরীর চেষ্টা চলছে। এর বিরুদ্ধে বামপন্থীরা দেশজুড়ে আন্দোলন করছেন। চেষ্টা করছেন মানুষকে সতর্ক করার। যে মহামানবের জন্মের দ্বিশত বর্ষে আমরা তাঁকে স্মরণ করছি, সেই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগররের জীবন কাহিনী এ মুহূর্তে আমাদের আরও বেশী বেশী করে স্মরণ করা প্রয়োজন। বর্তমান পরিস্থিতিকে ভেদ করতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবন দর্শন আমাদের চলার পথে শক্তি যোগাবে। মনে রাখতে হবে নিজের লক্ষ্যে অবিচল ছিলেন বলেই গোটা সমাজের তথাকথিত সমাজপতিদের বাধ্য সত্ত্বেও তিনি সমাজে অবহেলিত মহিলাদেরকে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন বিধবা বিবাহের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে স্বাক্ষরকারীর সংখ্যা বেশী হলেও তিনি হার মানেননি। বিধবা বিবাহ আইন পাশ করিয়ে ছিলেন। যে মতাদর্শে আমরা বিশ্বাসী নির্বাচনে তার সাময়িক ক্ষয় ঘটলেও বামপন্থা কখনও অপ্রাসঙ্গিক হতে পারে না। আমাদের কাজ নিজ মতাদর্শে অবিচল থেকে আগামীর লড়াইতে সঠিক ভূমিকা গ্রহণ করা। এদিনের প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে শতাধিক সদস্যবন্ধু ও ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠনের বিভিন্ন নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন। □

দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১৯

২৫.৮ থেকে ২০৩৫ সালের মধ্যে ৫০ শতাংশে নিয়ে যেতে হবে। সেই লক্ষ্যপূরণে খসড়া শিক্ষানীতিতে তাই প্রস্তাব রাখা হয়েছে।

বর্তমানে উচ্চশিক্ষায় অনেকগুলি নিয়ন্ত্রক থাকার ফলে উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলির স্বশাসন প্রক্রিয়া ব্যাহত হয় এবং এগুলি ঐ নিয়ন্ত্রকদের কাছে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। তাই খসড়াতে প্রস্তাব করা হয়েছে National Higher Education Regulatory Authority (NHERA) গঠন করার। এই সংস্থা পেশাগত ও কারিগরি শিক্ষাসহ শিক্ষাক্ষেত্রে অন্যান্য নির্দিষ্টি নিয়ন্ত্রকের পরিবর্তে স্বাধীনভাবে কাজ করবে। ফলে এ আই সি টি ই এবং বার কাউন্সিল ও মেডিক্যাল কাউন্সিলের কাজ হবে কেবল পেশাগত প্র্যাকটিসের মানটুকু নির্ধারণ করা এবং ইউ জি সি-র কাজ হবে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে অর্থ বরাদ্দ করা। NAAC (National Assessment and Accreditation Council) কে U G C থেকে পৃথক করা হবে এবং তা স্বশাসিত সংস্থা হিসাবে কাজ করবে। 'ন্যাক' হবে সর্বোচ্চস্তরে স্বীকৃতিস্থাপক সংস্থা এবং তা অন্যান্য স্বীকৃতি স্থাপন প্রতিষ্ঠানগুলিকে লাইসেন্স দেবে।

বর্তমানে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরি করতে হলে সংসদ ও বিধানসভার অনুমোদন প্রয়োজন। খসড়ায় বলা হয়েছে NHERA থেকে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার সনদ নিয়ে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা যাবে। তবে নবগঠিত এইসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ৫ বছরের মধ্যে 'ন্যাক' স্বীকৃতি মান অর্জন করতে হবে।

উচ্চশিক্ষা কাঠামোকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হবে। সেগুলি হলো—(১) গবেষণা বিশ্ববিদ্যালয়—এরা শুধু গবেষণা ও গবেষণা পদ্ধতি দেখাশোনা করবে। (২) শিক্ষণ বিশ্ববিদ্যালয়— যেখানে উচ্চশিক্ষার পঠন পাঠন হবে। (৩) স্বশাসিত স্নাতক স্তরের কলেজ— যেখানে পাঠদান প্রক্রিয়া চলবে।

কমিটির মতে ভারতে গবেষণা ও উদ্ভাবনীমূলক কাজে ব্যয় হয় জি ডি পির মাত্র ০·৭ শতাংশ, যেখানে চীনে হয় ২·১ শতাংশ, আমেরিকায় ২·৮ শতাংশ। প্রতি লক্ষ জনসংখ্যায় ভারতে গবেষক ১৫ জন, চীনে ১১১ জন, আমেরিকায় ৮২৫ জন। এই ক্ষেত্রে অগ্রগতির জন্য খসড়া প্রস্তাবে সুপারিশ করা হয়েছে National Research Foundation নামে একটি স্বয়ংশাসিত সংস্থা গড়ে তোলা হবে, যারা গবেষণার গুণমানের বিষয়টি দেখবে। কেন্দ্রীয় সরকার বছরে ২০ হাজার কোটি টাকা এই সংস্থাকে মঞ্জুর করবে।

প্রতিটি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে পঠন-পাঠন পরিচালনা, বিষয়গত উৎকর্ষতা অর্জন ও সম্পদ তৈরিতে স্বাধীনতা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। ২০৩২ সালের মধ্যে স্বীকৃতি অর্জনকারী সমস্ত উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিজেরা ডিগ্রী ও ডিপ্লোমা দিতে পারবে। ঐ সময়সীমার মধ্যে Affiliatad কলেজগুলি হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সংযুক্ত হবে, অথবা নিজেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হবে। ২০২০ সালের পর আর কোন Affiliated কলেজ গড়ে তোলা যাবে না। উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে ২০৩০ সালের মধ্যে ছাত্র শিক্ষক অনুপাত ৩০:১ সুনিশ্চত করতে হবে।

২০২৯ সালের মধ্যে সমস্ত কলেজগুলিতে এক বছরের বি এড কোর্স সহ চার বছরের সুসংহত স্নাতক কোর্স চালু করা হবে। প্রস্তাবে আরো বলা হয়েছে, বেসরকারী উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান যারা এই পলিসি রূপরেখায় আসছে না তাদের জন্য সংরক্ষণের গাইড লাইন মানা বাধ্যতামূলক হবে না।

উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে অনেক গালভরা প্রতিশ্রুতি খসড়া দলিলে থাকলেও এতে প্রচুর অসামঞ্জস্যও রয়েছে। শিক্ষক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থায় জোর দিতে বলা হয়েছে, তিন বছরের স্নাতক কোর্সের সাথে এক বছরের বি এড জুড়ে দিয়ে চার বছরের ইন্টিগ্রেটেড কোর্স চালু করার এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নিয়ে আসার কথা। কলেজের ব্যবস্থাপনায় আনা যেতে পারে, কিন্তু এটা গ্র্যাজুয়েশনের সাথে জুড়ে দিয়ে চার বছরের বাধ্যতামূলক ইন্টিগ্রেটেড পাঠক্রম করার কথা বলে একজন শিক্ষার্থীর স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে না কি? সবার পক্ষে ঐভাবে পড়া না'ও সম্ভব হতে পারে। সবাই না'ও চাইতে পারে। ভবিষ্যতে শিক্ষক যারা হতে চায় তাদের জন্য এই অপশন রাখাটাই সমীচীন।

উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানগুলিকে গবেষণা বিশ্ব বিদ্যালয়, শিক্ষণ বিশ্ববিদ্যালয় এবং সাধারণ কলেজ এই তিনভাগে ভাগ করা হবে। বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত কলেজ ব্যবস্থা তুলে দিয়ে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত কলেজগুলিকে স্বাধীন ডিগ্রীদানকারী কলেজে রূপান্তরিত করতে হবে, অথবা এদেরকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে মিশে যেতে হবে। কিন্তু কলেজগুলি ডিগ্রী দান করলে সমমান বজায় থাকার নিশ্চয়তা দলিলে নেই। বরঞ্চ কলেজগুলি ডিগ্রী বিতরণের কেন্দ্রে পরিণত হলে দুর্নীতি বাড়তে পারে।

শিক্ষানীতিতে ইউজিসি-র পরিবর্তে NHERA নামে যে অথরিটি লাগু করার কথা বলা হয়েছে তাতে কেন্দ্রীয়করণ বাড়ার আশঙ্কা থাকছে। বলা হয়েছে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির যোগ্যতামানের স্বীকৃতি দেওয়া হবে গ্রেডেড অটোনমির সাথে সামঞ্জস্য রেখে। এর দ্বারা বেসরকারীকরণের মাত্রা তীব্র করতে চাওয়া হয়েছে। অনলাইন কোর্সের উপর বেশি জোর দিয়ে পরিকাঠামো গড়ার দায় সরকার ঝেড়ে ফেলতে চাইতে। এতে লাভ হবে শিক্ষা ব্যবসায়ীদের।

অতিরিক্ত অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়—দলিলের এই পর্বে শিক্ষায় প্রযুক্তি, শিক্ষা সংক্রান্ত জাতীয় তথ্য ভাণ্ডার, কারিগরী শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা, শিক্ষা পুনর্গঠন ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

শিক্ষায় প্রযুক্তি প্রসঙ্গে বলা হয়েছে সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে বৈদ্যুতিন করতে হবে এবং প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়াতে হবে। জাতীয় স্তরে এর জন্য একটি মিশন প্রকল্প গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে। শিক্ষা সংক্রান্ত জাতীয় তথ্য ভাণ্ডার গড়ে তুলতে হবে যেখানে প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের তথ্য ডিজিটাল ফর্মে থাকবে। কারিগরী শিক্ষা প্রসঙ্গে কমিটির প্রস্তাব দেশের সমস্ত বিদ্যালয়, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে আগামী ১০ বছর সময়সীমায় ক্রমান্বয়ে সুসংহত কারিগরী শিক্ষা কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে। সমস্ত বিদ্যালয়ে নবম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের কারিগরী মানের শিক্ষা নিতে হবে। নতুন যে সব উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠশন গড়ে উঠবে সেখানে স্নাতকস্তরের শিক্ষার মধ্যেই কারিগরি শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত হবে। বর্তমান চালু উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মোট শিক্ষার্থীর ৫০ শতাংশকে ২০২৫ সালের মধ্যে কারিগরি শিক্ষায় দক্ষ করতে হবে।

বয়স্ক শিক্ষা প্রসঙ্গে খসড়ায় একটি স্বশাসিত সংস্থা Central Institute of Adult Education গড়ার প্রস্তাব করা হয়েছে, যা NCERT-র সহযোগী সংস্থা হিসাবে কাজ করবে। এই সংস্থা বয়স্ক শিক্ষার জন্য একটি জাতীয় পাঠক্রম রচনা করবে, যার মধ্যে থাকবে ভিত্তিমূলক শিক্ষা ও গণনা শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষায় দক্ষতা অর্জন, বুনিয়াদী শিক্ষা এবং ধারাবাহিক শিক্ষা। ২০২৫ সালের মধ্যে ৫ বছরের উর্ধ্বে সকলের জন্য সাক্ষরতা লক্ষ্য পূরণ করতে হবে। প্রতিটি বিদ্যালয় কমপ্লেক্সে বয়স্ক স্বাক্ষরতা কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে।

শিক্ষা পুনঃগঠন প্রসঙ্গে কমিটির বক্তব্য বর্তমান শিক্ষা পরিচালনা পদ্ধতি পুনর্যাচাই করে দেখতে হবে এবং বিভিন্ন মন্ত্রক, বিভাগ ও সংস্থার মধ্যে সমন্বয় গড়ে তুলতে হবে। এই বিষয়ে প্রস্তাব করা হয়েছে সর্বভারতীয় স্তরে একটি জাতীয় শিক্ষা কমিশন গড়ে তোলা হবে। এর সম্ভাব্য নাম "রাষ্ট্রীয় শিক্ষা আয়োগ" (RSA)। শিক্ষার ক্ষেত্রে এটিই হবে সর্বোচ্চ সংস্থা যার মাথায় থাকবেন প্রধানমন্ত্রী। এছাড়া শিক্ষামন্ত্রী, কয়েকজন আমলা ও শিক্ষাবিদ থাকবেন। এই সংস্থাই আমাদের দেশের শিক্ষা সম্পর্কে পরিকল্পনা করবে, রূপায়ণ করবে, পুনর্মূল্যায়ণ করবে। শুধু তাই নয় শিক্ষা সংক্রান্ত অন্যান্য যে সংস্থাগুলি আছে যেমন NCERT, প্রস্তাবিত NHERA (National Higher Education Regulatory Authority) এবং NRF (National Research Foundation) সহ অন্যান্য সংস্থার কাজ নীরিক্ষণ করবে ও পরামর্শ দেবে। কমিটির আরও প্রস্তাব সংসদে আইন করে RSAকে সাংবিধানিক মর্যাদা দেওয়া হবে।

খসড়ায় প্রস্তাব করা হয়েছে শিক্ষায় সরকারী ব্যয় হিসাবে জিডিপির ৬ শতাংশ অর্থ বরাদ্দ করতে হবে। উপরোক্ত অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পর্যালোচনা করলে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ উঠে আসে। "রাষ্ট্রীয় শিক্ষা আয়োগ" (RSA) তৈরি করার প্রস্তাব দিয়ে আসলে গোটা শিক্ষাব্যবস্থাকে কেন্দ্রীভূত নিয়ন্ত্রণে আনার পথকে সুগম করা হচ্ছে। 'নালন্দা', 'তক্ষশীলা' নামে দুটি মিশনের মাধ্যমে RSA শিক্ষানীতি কার্যকর করবে। স্বাধিকারের নামে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্পোরেট কায়দায় 'বোর্ড অব গভর্নরস' তৈরি করা হবে। এরমাত্র এক-তৃতীয়াংশ আসবে প্রতিষ্ঠানের ভিতর থেকে। তাও নির্বাচিত নয়, মনোনীত হয়ে। এরাই ঠিক করবে— উপাচার্য, শিক্ষক নিয়োগ থেকে শুরু করে প্রতিষ্ঠানের আর সব কাজ। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা থাকবে না।

উপসংহার

খসড়া জাতীয় শিক্ষানীতির মূল লক্ষ্য বর্তমান শিক্ষা পরিকাঠামোর খোল নলচে বদলে দেওয়া। চালু শিক্ষানীতির সম্ভাবনাগুলিকে ধারণ করে তাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া অথবা নেতিবাচক দিকগুলিকে কাটিয়ে তোলার কোনো পর্যালোচনামূলক দলিল এটি নয়। স্বাধীনতার পর থেকে শিক্ষা সংক্রান্ত যে দলিলগুলি জাতীয় শিক্ষানীতির বুনিয়াদ গঠন করেছিল যেমন রাধাকৃষ্ণন কমিটি রিপোর্ট (১৯৪৮), মুদালিয়ার কমিটি রিপোর্ট অন টেকনিক্যাল এডুকেশন এবং কোঠারি কমিশন রিপোর্ট (১৯৬৬)— তাদের মর্মবস্তুকে প্রত্যাখ্যান করেছে বর্তমান দলিল। বর্তমান দলিলটি গণতান্ত্রিক নীতি, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ইত্যাদিকে অস্বীকার করেছে। এই দলিলে শিক্ষা সংক্রান্ত নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা প্রশাসনিক কর্তাদের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে, অস্বীকার করা হয়েছে লোকসভা ও রাজ্য বিধানসভাগুলিকে। আসলে এই দলিলে প্রচ্ছন্ন ভাবে হলেও খুবই কার্যকরীভাবে রয়েছে বিশ্বায়িত বাজারী ভোগবাদের দর্শনের ছায়া। দেশের শিক্ষাক্ষেত্রকে এই খসড়া দলিল বাজারের হাতে সঁপে দিতে চেয়েছে। দলিল রচনাকারী কমিটি অনেক বিশেষজ্ঞদের সাথে কথা বললেও, গণতান্ত্রিক ভাবে নির্বাচিত শিক্ষক ও ছাত্র সংগঠনগুলির (এ বি ভি পি ছাড়া) সাথে আলোচনা করার প্রয়োজন মনে করেনি। দলিলটি সংবিধানের অষ্টম তপশিলভুক্ত সমস্ত ভাষাতে অনুবাদ করে প্রকাশ করা উচিত। যাতে আরও ব্যাপক মানুষ এই দলিলটি অনুধাবন করতে পারেন। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার গত প্রায় সাড়ে পাঁচ বছর ধরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি শাখায় দখলদারি চালাচ্ছে। ভারতীয় মূল্যবোধের শিক্ষার নামে সংঘ পরিবারের শিক্ষা দলিলকে (২০১৬ সালে অমরাবতী সম্মেলনে গৃহীত) কার্যকর করতে চাইছে। ধর্মনিরপেক্ষ ইতিহাস চেতনাকে ভেঙ্গে ফেলে শিক্ষায় গেরুয়াকরণের মাত্রাকে বাড়িয়ে চলেছে। খসড়া জাতীয় শিক্ষানীতি যেভাবে তৈরি হয়েছে তাতে শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ এবং সাম্প্রদায়িকীকরণের মাত্রাকে আরও বৃদ্ধি করতে বর্তমান শাসককুলের হাতেই অস্ত্র তুলে দেওয়া হবে। এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে সবাইকে।

এই খসড়া জাতীয় শিক্ষানীতি বাতিলের দাবিতে সোচ্চার হতে হবে সবাইকে। আমরা রাজ্য সরকারী কর্মচারীরাও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থে, দেশের ভবিষ্যতের স্বার্থে চুপ করে থাকতে পারি না। আমাদের মত করে প্রতিবাদে সামিল হব আমরাও। □

লড়াই জারি থাকবে, জয় আমাদেরই হবে

বিজয় শংকর সিংহ

সাধারণ সম্পাদক

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি

দেশ এক গভীর সঙ্কটের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। এর মধ্যে সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনে ফ্যাসিস্টধর্মী আর এস এস ও বিজেপি পুনরায় একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এরকম কঠিন পরিস্থিতিতে দেশের শ্রমিক কর্মচারী তথা সাধারণ গরীব মানুষ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সম্মুখীন হয়েছে এক বিশাল চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায়।

বিগত দিনগুলিতে বছরের পর বছর প্রথম আর এস এস-বি জে পি সরকার কখনও নোটবন্দী, জিএসটি চালু করার, কালো টাকা উদ্ধারের প্রতিশ্রুতি, ১৫ লক্ষ টাকা করে সাধারণ মানুষের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ঢুকিয়ে দেবে বা বছরে ২ কোটি বেকারের চাকরি দেবে, দেশের জিডিপি হার আকাশ ছোঁবে এমন ধরনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। যা তাক লাগিয়ে দেবার মতো। আর ছিল দেশের ৫৬ ইঞ্চির বুকের পাটার বুলি। যখন মানুষের মধ্যে সবটা যে ফাঁকা আওয়াজ তা প্রমাণিত হচ্ছে এবং সাধারণ মানুষের জীবনজীবিকা বাঁচাতে তারা ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে। বামপন্থীদের নেতৃত্বে শ্রমিক-কৃষক লঙ মার্চসহ রাজ্যে রাজ্যে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের চেহারা নিচ্ছে যা আছড়ে পড়ছে দেশের রাজধানীর রাজপথে। তখন লোকসভা নির্বাচনের আগে মানুষের নিটোল ঐক্যবদ্ধ চেহারাকে বিনষ্ট করতে উগ্র জাতীয়তাবাদী যুদ্ধোন্মাদনা মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করতে রাষ্ট্রপতি শাসন কাশ্মীরে পুলওয়ামা-বালাকোটের মতো ঘটনা ঘটে গেল। যা দেখে সাধারণ মানুষ বুঝে ছিল, “ ডাল মে কুছ কালা হ্যায়।” সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনে পরাজয় নিশ্চিত জেনেই আর এস এস ও বিজেপি তাদের শ্রেণী স্বার্থ চরিতার্থ করতেই কর্পোরেট মিডিয়ার সাহায্যে মানুষের জীবন জীবিকা ভয়ঙ্করভাবে যে আক্রান্ত তাকে আড়াল করতে সক্ষম হয়েছে।

এখন কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা ও ৩৫ ক ধারা বাতিল করা হয়েছে। সংবিধানকে রক্তাক্ত করা হয়েছে। কাশ্মীরের মানুষের গণতন্ত্র ও মানবাধিকার আজ আক্রান্ত। কাশ্মীর রাজ্য আর নেই, তা এখন কারাগারে পরিণত। মানুষের কথা বলার অধিকার নেই। রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা গৃহবন্দী। রাতারাতি একটি রাজ্য দেশের মধ্য থেকে ভ্যানিশ হয়ে গেল। দেশের বহুত্ববাদের ঐতিহ্য আজ আক্রান্ত। আবার গোদের উপর বিষফোঁড়ার মত এন আর সি আনা হচ্ছে। মানুষের নাগরিকত্ব নিয়ে অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দেওয় হচ্ছে। এন আর সি কে (National Registrer of Citizen) কেন্দ্র করে — আর এস এস বিজেপি যখন হুমকি দিয়ে আতংক ছড়িয়ে বিভাজনের রাজনীতিতে নতুন মাত্রা যুক্ত করছে, তখন আতংকগ্রস্ত সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছে একমাত্র বামপন্থীরা। পশ্চিমবাংলায় ডিটেনশন ক্যাম্প করলে তা গুড়িয়ে দেয়ার হুমকি দিয়েছে বামপন্থীরা। তাছাড়া এই ভয়ংকর অত্যাচারের বিরুদ্ধে মানুষকে সাহস যোগাতে আর.এস.এস, বিজেপি বিরুদ্ধে চোখে চোখ রেখে কথা বলছে ও প্রতিদিন রাস্তাতে লড়াই করছে।

আর এস এস-বিজেপি সরকার কর্পোরেট পুঁজির স্বার্থে কেন্দ্রীয় বাজেট করেছে। কর্মসংস্থানহীন বাজেট। শ্রমিক কর্মচারী ও জনবিরোধী বাজেট হয়েছে। স্বাভাবিকভাবে মানুষের দুর্দশা আরো বৃদ্ধি হচ্ছে। এবং চাকুরী চলে যাচ্ছে, মজুরী কমছে স্বাভাবিকভাবে ক্রয় ক্ষমতা কমছে মানুষের। বাজারে মন্দা চলছে। তাকে আড়াল করতেই মানুষের মধ্যে বিভাজনের রাজনীতি করছে। আর সেই ধরনের ইস্যুগুলি সামনে আনছে যেগুলি সরাসরি মানুষের আত্মপরিচিতি, নাগরিকত্ব, ভোটদানের অধিকার সরকারী স্বীকৃতির সাথে যুক্ত। উগ্র জাতীয়তাবাদী আগ্রাসী প্রচারের সাথে সাথে হিন্দুরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জিগির তুলছে। যেন হিন্দু রাষ্ট্র সব সমস্যার সমাধান করে দেবে। এ এক অঘোষিত এমারজেন্সী এবং যেন মনে হচ্ছে দেশের সংখ্যালঘুরা এইসব ঘোষণার বা প্রচারের জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হয়ে গেছে। তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কোন আদেশ জারি করতে হচ্ছে না। স্বাধীন ও কোন সভ্য দেশে এসব হতে দেওয়া যাবে না, লড়াই হবে। তাইতো বামপন্থীদের নেতৃত্বে সাধারণ মানুষ পথে নেমেছে। প্রত্যক্ষ সংগ্রাম চলবে। দেশ স্বাধীন হওয়ার স্বপ্নে যারা নিজেদের জীবন দিয়েছিলেন বা শহীদ হয়েছেন তাদের আত্মত্যাগ বিফলে যাবে না, যেতে পারে না। আর যারা সেই সময় দাসখত ও মুচলেকা দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ধরিয়ে দিতে সাহায্য করেছিল এবং জেল থেকে বেরিয়ে দেশদ্রোহিতার কাজ করেছিল তাদের মানুষ ক্ষমা করবে না, করতে পারে না। স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐতিহ্য, ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধানকে কার্যত তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে অমিত শাহ ও মোদিজি মনে করেন দেশের ইজারা নিয়েছেন তাহলে ভুল করবেন। মূর্খের স্বর্গে বাস করছেন। ভারতকে যারা হিন্দুরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার স্বপ্ন দেখছে তাদের বলছি সারা দেশে অলংঘনীয় মানব প্রচার তুলে প্রতিরোধ গড়ে তুলবে বামপন্থীরাই। সুতরাং আমাদের কাছে এক বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে দেশের ঐক্য ও সংহতিকে রক্ষা করাসহ বিকল্প ভাষ্য তুলে ধরা, দেশের সাধারণ মানুষের জীবন-জীবিকা আক্রান্ত ও আরো দুর্বিসহ ও যন্ত্রনাক্লিষ্ট হবে তাকে মোকাবিলা করতে সাধারণ মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে ধারাবাহিকভাবে আন্দোলন সংগ্রাম সংগঠিত করা। যা ইতিমধ্যে ৩০ সেপ্টেম্বর ’১৯ দিল্লীর রাজপথে বামপন্থীদের নেতৃত্বে লক্ষাধিক শ্রমিক-কর্মচারী-কৃষক তথা শ্রমজীবি মানুষের জমায়েত ও গন কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং পরিস্থিতি মোকাবিলায় ৮ জানুয়ারী ’২০ সারা দেশে সাধারণ ধর্মঘট-এর কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে।

আমাদের রাজ্য জুড়ে পরিস্থিতি আরো ভয়াবহ আকার নিচ্ছে। বর্তমান রাজ্যের শাসক দলের ন্যাক্কারজনক ভূমিকার জন্যই আজ রবীন্দ্র-নজরুলের দেশে সাম্প্রদায়িক শক্তি মাথা চাড়া দিয়েছে ও তাদের শক্তি বৃদ্ধি ঘটেছে। যা বামফ্রন্টের ৩৪ বছরে কোন দিন ভাবা যেত না। সারা দেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির গর্ব ছিল এই পশ্চিমবাংলা।

বর্তমানে ভয়ংকরভাবে বহুমাত্রিক সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের রাজনীতির বিপদসহ রাজ্যের গণতন্ত্রের উপর নজিরবিহীন আক্রমণ নামিয়ে আনা হয়েছে। আর একদিকে শ্রমিক কৃষক আত্মহত্যা করছে। যুবক যুবতীদের কাজ নেই তারা দিশেহারা। সিঙ্গুর থেকে নবান্ন অভিযানে পুলিশের বেপরোয়া লাঠি চার্জ রক্তাক্ত হয়েছে যুব সমাজ। এবং লড়াকু যুবক যুবতীদের এ্যারেস্ট করা হয়েছে। প্রতিবাদ জানিয়ে সারা রাজ্য জুড়েই আন্দোলনের চাপে নিঃশর্ত মুক্তি দিতে বাধ্য হয়েছে কুৎসিৎ সরকার। পুলিশ ও লুম্পেন সমাজবিরোধীদের দিয়ে মানুষের আন্দোলন ও কণ্ঠরোধ করতে আক্রমণ করা হচ্ছে। কিন্তু বামপন্থীদের নেতৃত্বেই রাজ্যে গণতন্ত্র ও অধিকার রক্ষায় আন্দোলনে ভয়কে জয় করেই মানুষের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। একমাত্র বামপন্থীরাই রাজ্যের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষাসহ গণতন্ত্র রক্ষার আন্দোলনে রাস্তাতেই আছে।

প্রশাসনের অভ্যন্তরে পাহাড় প্রমাণ আর্থিক বঞ্চনা, বকেয়া ৫৬ শতাংশ (আনরিভাইস্‌ড স্কেলে) মহার্ঘভাতা, ষষ্ঠবেতন কমিশন দ্রুত চালু করা সহ একাধিক দাবিতে নবান্নে আন্দোলনরত ১৫ জন নেতৃত্বকে এ্যারেস্ট করাসহ দার্জিলিং, কালিম্পং ও মুর্শিদাবাদের বদলী করা হয়েছে। যা নজিরবিহীন এবং ভুভারতে কোথাও কোনদিন হয়নি। এক চুড়ান্ত স্বৈরতান্ত্রিক আক্রমণ নামিয়ে আনা হয়েছে।

বর্তমান সময় দাবি করছে কর্মচারীদের ঐক্যবদ্ধ করে অনেক হয়েছে এই মনোভাব নিয়েই প্রত্যক্ষ সংগ্রামে যাওয়া এবং সক্রিয়ভাবে দৃঢ়তার সাথে গর্জে ওঠার। প্রশাসনের অভ্যন্তরে ব্যাপক দুর্নীতি চলছে। এছাড়া ক্লাবকে টাকা দেওয়া, দুর্গাপুজোয় টাকা দেওয়া, এছাড়া উৎসব, মচ্ছব, কার্নিভালে দেদার হরিলুটের মতো খরচ হচ্ছে। অর্থাৎ সরকারী টাকা (জনগণের টাকা) স্বেচ্ছাচারের সাথে অনৈতিকভাবে বিলিবন্টন হচ্ছে যা আমরা অতীতে দেখিনি। এককথায় ব্যাপকভাবে জনগণের টাকার লুঠতরাজ চলছে যা ভুভারতে কোথাও দেখা যাবে না। এছাড়া মুখ্যমন্ত্রীসহ অনান্য মন্ত্রীদের একাধিকবার লক্ষাধিক টাকা বেতন বৃদ্ধি।

আমারা তো ন্যায্য দাবি নিয়ে লড়াই করছি। আমরা আমাদের ন্যায্য দাবি প্রাপ্য বা সম্মান থেকে বঞ্চিত হব কেন? এতো কোন দয়ার দান নয়। যার আইনি অধিকার বামফ্রন্ট সরকার দিয়েছিল তা এই সরকার অস্বীকার করছে। আবার রাজ্য সরকার বলছে কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতা পেতে হলে কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরি করতে। অসংবিধানিক বক্তব্য বলছে।

আমাদের সংগঠন কোন দিন নীতিগত প্রশ্নে মাথা নত করেনি করবেও না। আমাদের সংগঠন কোন ভুঁইফোড় সংগঠন নয়। রাজ্যের কোন কোন সংগঠন-ধর্মঘট করে না। ধর্মঘটে ডাকলে বলে আমরা ধর্মঘট করি না। পৃথিবীতে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না যে কোন ট্রেড ইউনিয়ন ধর্মঘট করে না। কর্মচারীরা এদের বিদ্রুপ করে বলে এরা মেকি ট্রেড ইউনিয়ন “খাও, পিও, জিওর” ট্রেড ইউনিয়ন। শ্রমিকরা যখন দেখে দর কষাকষির জায়গা হারিয়ে যায় তখন ধর্মঘটে যেতে বাধ্য হয়।

আগামীতে কর্মচারী সমাজ ও তার পরিবারের প্রতি দায়িত্ববোধ থেকে সংগ্রাম আন্দোলন আরো তীব্র করে প্রশাসনকে স্তব্ধ করে দিয়ে সংগঠন রাস্তাতেই থাকবে। আমাদের আন্দোলনের চাপে সরকার বাধ্য হয়েছে আমাদের সাথে আলোচনা করতে, আমরা নীতিগত প্রশ্নে দাবিদাওয়া নিয়ে বক্তব্য রেখে এসেছি। সরকার ষষ্ঠ বেতন কমিশন ঘোষণা করেছে। বকেয়া মহার্ঘভাতা ও এরিয়ার নিয়ে কোন বক্তব্য নেই। এছাড়া বাড়ি ভাড়া ভাতা কমিয়ে ১২ শতাংশ করা হয়েছে। ০১/০১/২০১৬-র পূর্বের পেনশনার্সদের পেনশনের ওপর ৪০ শতাংশ ফিটমেন্ট ওয়েটেজ প্রদান করা হয়নি। আমরা বলেছি অসম্পূর্ণ, বিভ্রান্তিমূলক ও প্রতারণামূলক ঘোষণা করা হয়েছে। তীব্র নিন্দা ধিক্কার প্রতিবাদ জানানোও হয়েছে।

সারা রাজ্যজুড়ে ছুটি পর্যায়ে শারদিয়া অবকাশের মধ্যেই দুদিন ব্যাপক কর্মচারীর উপস্থিতিতে টিফিনের সময় বিক্ষোভ হয়েছে। বামফ্রন্ট সরকারের সময়কালে ৫টি বেতন কমিশন পেয়েছি। প্রথমে পে-কমিশনে সুপারিশ আমাদের দেওয়া হতো। এবার দেওয়া হল না। কি সুপারিশ ছিল কর্মচারীরা জানতেই পারল না। মহার্ঘভাতা কি হবে ও এরিয়ার কি হবে? সবটা অন্ধকারে রাখা হয়েছে। অতীতে প্রশাসনিক ভবনে মহার্ঘভাতা বা বেতন কমিশন নিয়ে সরকারের পক্ষে ঘোষণা হত, এখন দলীয় সভায় সরকার ঘোষণা করছে যা প্রশাসনিক রীতি-নীতির পরিপন্থী। এছাড়া ব্রিটিশ সার্ভিস কন্ডাক্ট রুলে সরকারী কর্মচারীদের সার্ভেন্ট বলা হত, বামফ্রন্ট সরকার ১৯৮০ সালে সার্ভেন্ট কথার পরিবর্তে গভর্ণমেন্ট এমপ্লয়ি কথাটি যোগ করে। এখন রোপা রুলে ১২নং অনুচ্ছেদে সার্ভেন্ট কথাটি যুক্ত করা হয়েছে। ২.৫৭ স্যাট্রিক্স অনুযায়ী বেতন নির্ধারণ করা হয়েছে অথচ বিভিন্ন ভাতার হার সেই ম্যাট্রিক্স অনুযায়ী না করে খুশিমত করা হয়েছে। এক কথায় বেতন কমিশনের ধারণা (Concept) কে অস্বীকার করা হচ্ছে। এর ফলে মধ্যবিত্ত কর্মচারী সমাজ ও শিক্ষক মহাশয়গণ চূড়ান্ত সামাজিক অপমান ও সীমাহীন আর্থিক বঞ্চনার শিকার হবে। স্বাভাবিকভাবে রাজ্য সরকারের কোষগাড় থেকে বেতনপ্রাপ্ত কর্মচারী সমাজ ও শিক্ষক মহাশয়দের মধ্যে দারুণ ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। তারা দাবানলের মতো ফুঁসছে।

তাই রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটিসহ রাজ্য সরকারের কোষাগাড় থেকে বেতনপ্রাপ্ত পঞ্চায়েত, বোর্ড কর্পোরেশন, শিক্ষক মহাশয়গণ ও শিক্ষা কর্মীসহ সব অংশের কর্মচারীদের নিয়ে রাজ্য সরকারের এই অসম্পূর্ণ বিভ্রান্তিকর, প্রতারণামূলক ঘোষণার প্রতিবাদে এবং বকেয়া মহার্ঘভাতা, ৬ষ্ঠ বেতন কমিশন যথাযথভাবে কর্মচারীদের সর্বোচ্চ স্বার্থকে মান্যতা দিয়ে চালু করাসহ একাধিক দাবিতে আগামী ২৬ নভেম্বর ২০১৯ অর্ধদিবস /পূর্ণদিবস ছুটি নিয়ে কলকাতায় বেলা ২টায় কেন্দ্রীয় জমায়েতের কর্মসূচীতে সমস্ত কর্মচারী বন্ধুদের সামিল হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি। সামনে দিন জোর লড়াই জোট বাঁধ তৈরি হও। □

বেতন কমিশনের নিষ্ঠুর বঞ্চনার প্রতিবাদে কর্মচারী-শ্রমিক-শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী-পঞ্চায়েত-বোর্ড কর্পোরেশন কর্মচারীদের দাবী

(১) পে-কমিশনের সুপারিশ সংক্রান্ত রিপোর্ট সংগঠনগুলিকে প্রদান।

(২) পে-কমিশনের অসংগতি সমূহ দূরীকরণ ও বাড়ীভাড়া ভাতা পূর্বের ন্যায় ১৫ শতাংশ হারে প্রদান করতে হবে। ০১.০১. ২০১৬ থেকেই সংশোধিত বেতনের আর্থিক সুবিধা প্রদান করতে হবে।

(৩) সংশোধিত বেতন কাঠামোর সঙ্গে কেন্দ্রীয় হারে প্রাপ্য মহার্ঘভাতা দিতে হবে।

(৪) ন্যূনতম বেতন ১৮ হাজার টাকা করতে হবে।

(৫) ০১.০১.২০১৬ পূর্ববর্তী পেনশনার্সদের পেনশনের উপর ৪০ শতাংশ ফিটমেন্ট ওয়েটেজ দিতে হবে।

(৬) চুক্তিতে ও অস্থায়ী প্রথায় নিযুক্ত কর্মীদের নিয়মিতকরণ সাপেক্ষে সমকাজে সমবেতন দিতে হবে।

(৭) রাজ্য প্রশাসন, পঞ্চায়েত, পৌরসভা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারী বিধিবদ্ধ সংস্থাগুলির সর্বস্তরে শূন্যপদে স্থায়ী নিয়োগ করতে হবে।

(৮) ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার ও ধর্মঘটের অধিকার সুনিশ্চিত করতে হবে।

আলোচনা সভা

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারী পেনশনার্স সমিতির মুখপত্র ‘প্রবীণ কণ্ঠ’ প্রকাশনার ২৫ বছর উদ্‌যাপনের সূচনায় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপর একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় ২৩শে সেপ্টেম্বর বেলা ৩ টায় কৃষ্ণপদ ঘোষ মেমোরিয়াল ট্রাস্ট ভবনে।

আলোচনার শিরোনাম ছিল - “জন্মের ২০০ বছর পরেও বিদ্যাসাগর চর্চার প্রাসঙ্গিকতা”। আলোচক- অধ্যাপক শ্রী সুদিন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। সভাপতিত্ব করেছেন প্রবীণ কণ্ঠের সম্পাদক বিপ্লব মুখোপাধ্যায়।

২৪ সেপ্টেম্বর বেলা ৩ টায় উপরিউক্ত হলে সমিতির ৩০ বর্ষ পূর্তিতে আলোচনা সভা হয় ‘জন্মের শতবর্ষ পরে অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় আলোচনার প্রয়োজনীয়তা’। আলোচনা করেছেন অধ্যাপক শ্রী শ্যামল চক্রবর্তী মহাশয়। সভাপতিত্ব করেছেন সমিতির অন্যতম সহ-সভাপতি ভানুদেব চক্রবর্তী।

বক্তাদের আলোচনা মনোজ্ঞ ও হৃদয়গ্রাহী হয়েছে। উপস্থিত সমিতির সদস্যরা খুবই উপকৃত হয়েছেন। কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুসারে ২৪ সেপ্টেম্বর বেলা ২-৩০ মিঃ বি.এস.এন.এল ঠিকা শ্রমিক-কর্মচারী নেতৃত্বের হাতে তাদের আন্দোলনের প্রতি সংহতি ও সহমর্মিতা জানিয়ে ৫০ হাজার টাকা তুলে দেওয়া হয়। গৃহীত প্রস্তাবটির বয়ান নীচে উল্লিখিত হল। □

বি এস এন এল ঠিকা শ্রমিকদের পাশে পেনশনার্স সমিতি

বি এস এন এল ঠিকা শ্রমিক কর্মচারীরা দীর্ঘ ৭-৮ মাস যাবৎ কোন বেতন পাচ্ছেন না। তাঁরা অনশন সহ বিভিন্ন ধরণের আন্দোলন লাগাতারভাবে চালিয়ে যাচ্ছেন। ইতিমধ্যেই অনশনরত অবস্থায় কয়েকজন প্রয়াত হয়েছেন।

সমগ্র পরিস্থিতি বিবেচনায় রেখে আন্দোলনরত বি এস এন এল ঠিকা শ্রমিকদের প্রতি সংহতি ও সহযোগিতা জানাতে ৫০ হাজার টাকার সামান্য আর্থিক সহায়তা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারী পেনশনার্স সমিতির পক্ষ থেকে প্রদান করা হয়। □

৬ষ্ঠ বেতন কমিশন ঃ বঞ্চনার কমিশন

বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী

যুগ্ম-সম্পাদক, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির উদ্যোগে দীর্ঘ ৪ বছর ধরে ধারাবাহিক বহুমুখী আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে গত ২৫ সেপ্টেম্বর রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে সংশোধিত বেতন ও ভাতাদি সংক্রান্ত রোপা রুলস্ ২০১৯ প্রকাশ করা হয়। গত ১৩ সেপ্টেম্বর এক দলীয় সভায় মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন ৬ষ্ঠ বেতন কমিশন তাদের রিপোর্ট সরকারের কাছে জমা দিয়েছে। সমস্ত সংবাদ মাধ্যমে এই সংবাদ প্রকাশিত হলেও, এবার বেতন কমিশনের রিপোর্ট অন্যান্যবারের ন্যায়, বিশেষত দুটি বেতন কমিশনের মত সাড়া ফেলতে পারেনি। অর্থনীতিবিদ্ অভিরূপ সরকারের নেতৃত্বাধীন ৬ষ্ঠ বেতন কমিশন রাজ্য সরকারের কাছে তাদের সুপারিশ জমা দিলেও কি কারণে সেই জমাকৃত রিপোর্ট প্রকাশ্যে আনা হয়নি তার কোন যুক্তিগ্রাহ্য কারণ উপস্থাপন করা হয়নি। এমনকি কর্মচারী সংগঠনগুলিও এই রিপোর্ট পায়নি। ৬ষ্ঠ বেতন কমিশনের নির্ধারিত সময়সমীার মধ্যে কর্মচারীদের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠনগুলি তাদের স্মারকলিপি জমা দেওয়া সত্ত্বেও তাদেরকে সেই কপি না দেওয়া আসলে, গণতান্ত্রিক অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ। এমনকি বেতন কমিশনের রিপোর্ট পাওয়ার পর রাজ্য সরকার সংগঠনগুলির সাথে কোন আলোচনা না করে একতরফাভাবে সুপারিশ গ্রহণ করে। বেতন কমিশনের সুপারিশ প্রকাশ্যে না আসায় মূল বিচার্য দৃষ্টিভঙ্গী ও নীতিসমূহ অন্ধকারে রাখা হয়েছে। সংশোধিত বেতন কাঠামো ১.১.২০১৬ থেকে কার্যকরী করা হলেও বকেয়া পাওনা মিটিয়ে দেওয়া সংক্রান্ত বিষয়ে বেতন কমিশনের নীতিগত অবস্থান অস্পষ্ট ও অস্বচ্ছ থেকে গিয়েছে। অতীতে যে কটি বেতন কমিশন কার্যকরী হয়েছে প্রতিটি ক্ষেত্রে বকেয়া পাওনা (Arrear) মিটিয়ে দিয়েই তা হয়েছে। ব্যতিক্রম ৬ষ্ঠ বেতন কমিশন। এর মধ্য দিয়ে কর্মচারী-শিক্ষক সমাজসহ সংশ্লিষ্ট সকলের মধ্যে সংশয়, ক্ষোভ ও অসন্তোষ তৈরী হয়েছে।

ন্যূনতম বেতন নির্ধারণ

কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের জন্য গঠিত সপ্তম বেতন কমিশন দেশের সমস্ত শহর, আধাশহর ও গ্রামাঞ্চলে ২০১৬ সালের জানুয়ারী মাসে ন্যায্যমূল্যের দাম সংগ্রহ করে ডঃ অ্যাক্রায়েডের সূত্র মেনে প্রয়োজনভিত্তিক ন্যূনতম মাসিক বেতন নির্ধারণ করে ১৮,০০০ টাকা। কর্মচারী সংগঠনের (স্টাফ সাইড) দাবী ছিল বাজারদরের নিরিখে ন্যূনতম মাসিক বেতন নির্ধারিত হওয়া উচিত ২৬,০০০ টাকা। বিচারপতি অশোক মাথুরের নেতৃত্বে গঠিত বেতন কমিশনের সুপারিশ কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করে। কম হলেও সারা দেশের শ্রমিক-কর্মচারীরা সাধারণভাবে এই নীতি মেনে নেয়। সেই নিরিখে কমিশন নির্ধারিত ন্যূনতম মাসিক বেতন ১৮,০০০ টাকা হলেও বেতন নির্ধারণের গুণিতক (ফিটমেন্ট ফর্মুলা) নির্ধারিত হয় (১৮,০০০÷৭০০০) বা ২.৫৭। কেন্দ্রীয় সরকার তাদের কর্মচারীদের ক্ষেত্রে গ্রুপ ডি পদের অবলুপ্তি করে যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের গ্রুপ সি পদে উন্নীত করে। সেই হিসেবে গ্রুপ সি পদে গ্রুপ মাসিক ন্যূনতম বেতন ৭০০০ টাকা হিসাবে এই ফিটমেন্ট নির্ধারিত ধরে। কিন্তু রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রে গ্রুপ ডি পদে ন্যূনতম বেতন ৬,৬০০ টাকা হিসাবে ফিটমেন্ট ফর্মুলা হওয়া উচিত ছিল ২·৭২ (২৮০০০÷৬৬০০)। কিন্তু পশ্চিমবাংলার রাজ্য সরকার ৬ষ্ঠ বেতন কমিশনের সুপারিশ কার্যকরী করে ন্যূনতম বেতন নির্ধারণ করেছে ১৭০০০ টাকা। এরফলে দীর্ঘ ৪০ বছর পর রাজ্য কর্মচারীদের ন্যূনতম বেতন হ্রাসপ্রাপ্ত হলো। অন্যান্য অংশের শ্রমজীবীদের এমনকি আধিকারিকদের বেতনও ক্ষয়প্রাপ্ত হলো। কেন্দ্রীয় সরকার সপ্তম বেতন কমিশন কার্যকরী করে পাঁচ ধরনের ম্যাট্রিক্স যথাক্রমে ২·৫৭ ২·৬২, ২·৬৭, ২·৭২ এবং ২·৮১ নির্ধারণ করে। কিন্তু ৬ষ্ঠ বেতন কমিশনে তিন ধরনের ম্যাট্রিকক্স ২·৫৭, ২·৬২ এবং ২·৬৭ নির্ধারণ করা হয়। ফলে একই যোগ্যতা ও মর্যাদা সম্মান রাজ্য প্রশাসনের আধিকারিকদের ফিটমেন্ট বৈষম্যজনিত কারণে বেতনের বৈষম্য ঘটবে। শুধু আধিকারিক পর্যায়েই নয়, প্রয়োজনভিত্তিক ন্যূনতম বেতনের দাবীতে চারদশক ধরে লড়াইয়ের পর আশির দশক থেকে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীর ন্যায় কেন্দ্রীয় হারে বেতন ও মহার্ঘভাতার দাবী অর্জন করে। তার আগে ১৯৬৭ সালে প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে প্রচলিত মূল্যায়নের উপরে বেতন কাঠামো এবং মূল্য সূচকের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে বেতন নির্ধারণের সুপারিশ করেছিল প্রথম বেতন কমিশন (১৯৬৭-৬৯)। এরফলে দ্বিতীয় কমিশনের (১৯৭৯-৮০) সুপারিশের মধ্য দিয়ে পশ্চিমবাংলার শ্রমিক-কর্মচারীদের বেতন কাঠামো কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের তুলনায় (তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণী) উচ্চতর অবস্থানে ছিল। কিন্তু বর্তমান রাজ্য সরকারী ৬ষ্ঠ বেতন কমিশনের মাধ্যমে ন্যূনতম বেতন স্থির করে ১৭০০০ টাকা, যা কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের তুলনায় ১০০০ (এক হাজার) টাকা কম। এরফলে রাজ্য সরকারী কর্মচারীসহ রাজ্য কোষাগার থেকে বেতন প্রাপ্ত কর্মচারীদের ন্যূনতম বেতন ৪০ বছর পর হ্রাসপ্রাপ্ত হলো। মহামান্য উচ্চতম বিচারালয় সমকাজে সমবেতন সাপেক্ষে ন্যূনতম মজুরী নির্ধারণ করে ১৮০০০ টাকা। সেই নির্দেশকে উপেক্ষা করে সংগঠিত-অসংগঠিত শ্রমিক কর্মচারীদের ন্যূনতম বেতন নির্ধারিত মাপ কাঠি থেকে কম---এ এক চরম বঞ্চনা। রোপা রুলস্ '১৯'-র ছত্রে ছত্রে Govt. Servent উল্লেখ করা হয়েছিল যদিও তীব্র প্রতিক্রিয়ার বহিঃপ্রকাশ ঘটানোয় তার পরিবর্তন করা হয়। রাজ্যের কর্মচারী আন্দোলনের দীর্ঘ ইতিহাস হচ্ছে 'গোলাম' থেকে 'সেবকে' রূপান্তরের ইতিহাস। Servent থেকে Employee -তে রূপান্তর রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠার পরে কর্মচারীরা সেই অধিকার অর্জন করে। বর্তমানে সেই অর্জিত অধিকারের উপর আক্রমণ করে কুখ্যাত বৃটিশ সার্ভেন্ট কনডাক্ট রুলসকেই নতুন করে চালু করার ঘৃণ্য প্রক্রিয়া, অপরদিকে চরম আর্থিক বঞ্চনা— প্রয়োজন উভয়বিধ ঘৃণ্য পদক্ষেপের বিরুদ্ধে সম্মিলিত জোরালো প্রতিবাদ।

বকেয়া বেতন

দীর্ঘ টালবাহানার ৪ বছর পরে ৬ষ্ঠ বেতন কমিশন কার্যকরী করার ফলে ৪ বছরের বকেয়া মিটিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। অতীতে ৫টি বেতন কমিশনের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার তার সীমাবদ্ধ আর্থিক ক্ষমতার মধ্যেও হয় নগদে বা জি পি এফের মধ্য দিয়ে বকেয়া অর্থ প্রদান করেছে। রাজ্যের শাসক দল একসময়ে ২৭ মাসের বকেয়া মিটিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় এসেছিল। কিন্তু তা কার্যকরী করেনি। এরমধ্য দিয়ে শাসকদলের শ্রেণীদৃষ্টিভঙ্গী প্রতীয়মান হয়। ১৪ বছর পর সংশোধিত বেতন কার্যকর করা, যা চরম বঞ্চনা ছাড়া আর কি? ১৪ বছরে বৃদ্ধির হার ১ (১৪.২২÷১৪) শতাংশ। যেখানে ৫ম বেতন কমিশনে বৃদ্ধির হার ছিল ৩৩-৪০ শতাংশ, সেখানে বর্তমান বেতন কমিশনে বার্ষিক বৃদ্ধির হার মাত্র ১ শতাংশ। এই ভিক্ষা দানের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠা প্রয়োজন।

মহার্ঘভাতা

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের বেতনের যে ক্ষয় হয়, তা পূরণের জন্য নির্দিষ্ট সময়ান্তর কেন্দ্রীয় সরকার বেতন কমিশন গঠন করে। বেতন কমিশন All India Consumer Price Index -র উপর ভিত্তি করে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের বেতন সংশোধন বা বেতন বৃদ্ধির সুপারিশ করে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলি সেই সুপারিশ গ্রহণ করে কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি করে বাজার মূল্যের সঙ্গে বেতনের সমতা ফেরানোর প্রচেষ্টা গ্রহণ করে। অন্যদিকে চলতি বেতন কাঠামোর অভ্যন্তরে মূল্যবৃদ্ধির পূর্ণ ক্ষতিপূরণের জন্য সারা ভারতে কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতা প্রদানের দাবিটি এখন একটি স্বীকৃত দাবি। সর্বভারতীয় মূল্যসূচকের বৃদ্ধির সঙ্গে তাল রেখে নির্ধারিত হয় মহার্ঘভাতার হার। এ রাজ্যে কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতার বিষয়টি প্রথম বিবেচনা করে স্বল্পস্থায়ী দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার (১৯৬৯)। পরবর্তীতে কংগ্রেস সরকারের আমলে (১৯৭২-১৯৭৭) যা অস্বীকৃত হয়। ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠার পর ১৯৭৯ সালের ১লা এপ্রিল থেকে ধারাবাহিকভাবে কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতা প্রদান করা হয়েছে। বিগত ২০০৯-র রোপা রুলস-এও করবেন ও পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকার তা কার্যকরী করে। যার উপর ভিত্তি করেই মহামান্য বিচারালয় সম্প্রতি কেন্দ্রীয়হারে মহার্ঘভাতা প্রদানের নির্দেশ দেয়। আমাদের রাজ্যে দীর্ঘ ১৪ বছর পর বকেয়া ৪১ শতাংশ (অসংশোধিত বেতন কাঠামোয়) মহার্ঘভাতা মিটিয়ে না দিয়েই ৬ষ্ঠ বেতন কমিশন কার্যকরী করার আদেশনামা প্রকাশ করেছে বর্তমান রাজ্যসরকার।

রাজ্যে ৫ম বেতন কমিশন কার্যকরী করার সময়ে সংশোধিত হারে বকেয়া ১৬ শতাংশ মহার্ঘভাতা মিটিয়ে দিয়েই সংশোধিত বেতন কাঠামো কার্যকরী করা হয়েছিল, কিন্তু ৬ষ্ঠ বেতন কমিশন বকেয়া ৪১ শতাংশ মহার্ঘভাতা বাকী রেখেই বেতন কমিশন কার্যকরী করতে চাইছে। জানুয়ারী ২০২০ থেকে মহার্ঘভাতা ছাড়াই বর্ধিত বেতন কার্যকরী হবে। কেন্দ্রীয় ও অন্যান্য রাজ্যের সরকারী কর্মচারীদের ১৭ শতাংশ মহার্ঘভাতা চালু হয়ে নতুন করে এক কিস্তি মহার্ঘভাতা ঐ সময়ে বকেয়া হবে। সংশোধিত বেতনক্রম চালু হলে, কেন্দ্রীয় হারে বকেয়া মহার্ঘভাতার পরিমাণ ১৭ শতাংশ হলেও, বর্তমান অসংশোধিত বেতনক্রম অনুযায়ী এই বকেয়ার পরিমাণ হয় ৫৬ শতাংশ। এই বিপুল পরিমাণ মহার্ঘভাতা বকেয়া থাকা সত্ত্বেও 'রোপা ২০১৯'-এ এই বিষয়ে একটি শব্দও খরচ করা হয়নি। মুখ্যমন্ত্রীসহ মন্ত্রিসভার সদস্যদের লক্ষাধিক টাকার ভাতা বৃদ্ধি, ক্লাব, উৎসব, মহোৎসব, কার্নিভালে দেদার টাকা খরচ হচ্ছে। অথচ ৪ বছরের বকেয়া অর্থ না দিয়ে কর্মচারী সমাজ, শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী, পৌরসভা, পঞ্চায়েত, বোর্ড-কর্পোরেশনের কর্মচারী ও প্রবীণ অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের প্রতি পাহাড়প্রমাণ আর্থিক বঞ্চনা করা হচ্ছে, যা সমগ্র ভারতে কোথাও হয়নি। ৬ষ্ঠ বেতন কমিশনে বকেয়া মহার্ঘভাতা বিষয়ে একটি শব্দও ব্যবহার না করে যেভাবে পূর্ববর্তী ৫ম বেতন কমিশন ও মহামান্য বিচারালয়ের নির্দেশকে অবমাননা করা হলো, তাতে এই কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায়। একইভাবে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকেও এই বিষয়ে নিশ্চুপ থাকার মধ্য দিয়ে তাদের প্রকৃত শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গী প্রতীয়মান হয়, যা ভয়ংকর প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের তুলনায় এ রাজ্যের সরকারী কর্মচারীদের মহার্ঘভাতার হারের ব্যবধান বর্তমান সরকারের আমলে বেড়েছে তা নিয়ে সংশয় নেই। ৬ষ্ঠ বেতন কমিশনের চেয়ারম্যানের সাম্প্রতিক ব্যাখ্যায় তাঁর নীতিগত অবস্থান ও মহার্ঘভাতা বিষয়ে মনোভাব স্পষ্ট বোঝা যায়। তাঁর মতে উন্নয়নের খরচ বাড়ায় মহার্ঘভাতা বাড়ানো যাচ্ছে না। রাজ্য সরকার যেহেতু গরীবের পক্ষে তাই মধ্যবিত্ত সরকারী কর্মচারীদের মহার্ঘভাতা না দিয়ে সরকার 'গরিব মানুষের জন্য' এবং 'সর্বজনীন উন্নয়নের' লক্ষ্যে সামগ্রিক উন্নয়ন বাড়াতে আগ্রহী। রাজ্য সরকারের এই নীতির মধ্যে বেতন কমিশনের চেয়ারম্যান মহাশয় গরীবের সঙ্গে মধ্যবিত্তের একটা শ্রেণীদ্বন্দ্বও খুঁজে পেয়েছেন। কিন্তু 'গরীব মানুষের জন্য' এবং সর্বজনীন উন্নয়নের লক্ষ্যে রাজ্য সরকার রাজ্যের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের কত অংশ খরচ করছে? অভিরুপবাবু যে দুটি বছরের উল্লেখ করেছেন সেই বছরগুলিতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পরিসংখ্যান বলছে ২০১৪-১৫ সালে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মোট উৎপাদনের ৯·৫ শতাংশ খরচ হয়েছিল উন্নয়ন খাতে। যেখানে বিহার, উত্তরপ্রদেশ, ঝাড়খন্ড, ওড়িশার মতো রাজ্যের খরচ যথাক্রমে ২০·৬ শতাংশ, ১৭ শতাংশ, ১৭ শতাংশ এবং ১৮·৪ শতাংশ। ১৮টি মুখ্য রাজ্যের মধ্যে উৎপাদনের অনুপাতে উন্নয়নমূলক খরচের নিরিখে পশ্চিমবঙ্গের স্থান ১৪ নম্বরে। ২০১০-১১তেও ১৭টি রাজ্যের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ ১৪ নম্বরে অবস্থান করত। প্রকৃত খরচের পরিসংখ্যানের দিকে তাকালে দেখতে পাওয়া যায় ২০১৪-১৫ সালে পশ্চিমবঙ্গের প্রকৃত উন্নয়নমূলক খরচ ছিল সংশোধিত অনুমানের চেয়ে অনেক কম— মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ৮·৭ শতাংশ। ২০১০-১১ সালে এই অনুমান ছিল ৮·২ শতাংশ অর্থাৎ অনুপাত প্রায় অপরিবর্তিত অন্যদিকে বেতনখাতে ব্যয় কমেছে প্রভূত পরিমাণে। ২০১০-১১ সালে সরকারী কর্মচারীদের বেতন খাতে অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ৫·৪ শতাংশ খরচ হত। ২০১৪-১৫ সালে সেই অনুপাত কমে দাঁড়ায় ৩·৯ শতাংশ। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে 'মধ্যবিত্ত'র ওপর সরকারী খরচ কমে গেলেও উন্নয়নের খরচ প্রায় একই জায়গায় দাঁড়িয়ে। তাহলে রাজ্যের বাড়তি রাজস্ব আয় কোথায় খরচ হচ্ছে? ২০১০-১১ সালের তুলনায় ২০১৪-১৫ সালে বেতন বাবদ খরচ কমেছে। কিন্তু বেতন খাতে বাঁচানো টাকা যদি সম্পূর্ণভাবে অন্য কোথাও খরচ হত, তা হলে রাজ্যের রাজস্ব আয়ের অনুপাতে খরচ একই থাকত। কিন্তু ২০১০-১১ থেকে ২০১৪-১৫ সালের মধ্যে রাজস্ব আয়ের অনুপাতে প্রাথমিক রাজস্ব খরচ এবং সুদ ব্যতিরেকে অন্যান্য খরচ কমেছে যথাক্রমে ১২·৫ এবং ৫·৪ শতাংশ। অর্থাৎ যথাযথ হারে মহার্ঘভাতা না দিয়ে রাজ্য সরকার 'সর্বজনীন উন্নয়নে'-এ বাড়তি অর্থ খরচ না করে রাজস্ব ঘাটতি কমাচ্ছে।

যে রাজ্যে শিক্ষা-স্বাস্থ্য-খাদ্যের মতো ন্যূনতম চাহিদা থেকে অধিকাংশ মানুষ বঞ্চিত এবং সামগ্রিকভাবে গোটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই ভুগছে ক্রয়ক্ষমতার অভাবে, সেখানে খরচ কমিয়ে সরকারী ঘাটতি কমানোর কোনো যুক্তি নেই। আয়ের তুলনায় খরচ কমালে চাহিদা সঙ্কুচিত হয়, যাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় গরিব মানুষও। তাই এই কৃচ্ছ সাধন নীতির সাথে গরীবের সঙ্গে মধ্যবিত্তের শ্রেণী সংগ্রামের কোনো সম্পর্ক নেই। এই নীতি উভয় শ্রেণীকেই ক্ষতিগ্রস্ত করছে। অন্যান্য খরচ না কমিয়ে যথাযথ হারে

▶▶ নবম পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

Govt office staff employees

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

মহাত্মা গান্ধী

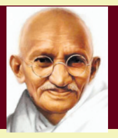

আমরা ইতোমধ্যেই ইউরোপের কয়েকজন বিখ্যাত পুরুষ ও মহিলার জীবনীর সংক্ষিপ্তসার এই কলামগুলিতে উল্লেখ করেছি। এই ধরনের সংক্ষিপ্ত জীবনীসমূহ উল্লেখ করার কারণই হল, আমাদের পাঠকবর্গ যাতে এঁদের জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং তাঁদে পথ অনুসরণ করে নিজেদের জীবনকে সার্থক করে তুলতে পারেন।

বাংলায় ব্রিটিশ পণ্য বর্জনের জন্য যে শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে উঠেছে, তা কম তাৎপর্যপূর্ণ নয়। বাংলায় এই ধরনের আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছে। কারণ এখানে শিক্ষার প্রসার ঘটেছে অনেক বেশী এবং বাংলার মানুষ ভারতের অন্যান্য অংশের তুলনায় বেশী সচেতন। স্যার হেনরি কটন মন্তব্য করেছেন, বাংলার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা কলকাতা থেকে পেশোয়ার পর্যন্ত বিস্তৃত। এর কারণগুলি জানা বিশেষ প্রয়োজন। এই সত্যকে অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই যে একটি দেশের উত্থান ও পতন নির্ভর করে সে দেশের মহাপুরুষদের ওপর। যে জনগণ মহাপুরুষের জন্ম দেয়, তারাই সে মহাপুরুষের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে পারে না। বাংলার বিশেষ অবস্থানের মূল কারণই হল, সেখানে গত শতাব্দীতে বহু মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেছেন। রামমোহন রায় থেকে শুরু করে একের পর এক নায়কোচিত ব্যক্তিত্ব বাংলাকে অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় উচ্চতর আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন। এটা বলা যেতে পারে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন এঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। 'বিদ্যাসাগর' যার অর্থ হল জ্ঞানের মহাসমুদ্র, ঈশ্বরচন্দ্রের একটি সম্মাননা, যা তাঁকে দিয়েছিলেন কলকাতার পণ্ডিতরা, সংস্কৃত ভাষায় তাঁর বিপুল পাণ্ডিত্যের জন্য। কিন্তু বিদ্যাসাগর শুধুমাত্র জ্ঞানের মহাসাগর ছিলেন না, তিনি ছিলেন একাধারে দয়া, মহানুভবতা ও অন্যান্য গুণাবলীরও মহাসাগর। তিনি ছিলেন হিন্দু এবং ব্রাহ্মণও। কিন্তু তাঁর কাছে হিন্দু ও মুসলমান, ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। তাঁর যে কোনো ভাল কাজে তিনি কখনও উঁচু এবং নীচু প্রভেদ করেন নি। যখন তাঁর অধ্যাপক কলেরায় আক্রান্ত হয়েছিলেন, তিনি নিজেই তাঁর সুশ্রুষা করেন। যেহেতু সেই অধ্যাপক ছিলেন দরিদ্র, তাই ঈশ্বরচন্দ্র নিজের খরচায় তাঁকে ডাক্তার দেখান এবং নিজের হাতে রোগীর মল-মূত্র পরিষ্কার করেন।

তিনি নিজে লুচি ও দই কিনে চন্দননগরে দরিদ্র মুসলমানদের খাওয়াতেন। এমন কি যাদের প্রয়োজন ছিল তাদের টাকা পয়সা দিয়েও সাহায্য করতেন। তিনি যদি রাস্তার ধারে কোন দুস্থ অথবা প্রতিবন্ধী মানুষকে দেখতে পেতেন, তাহলে তাদের নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে সেবা-যত্ন করতেন। তিনি অন্যের দুঃখে দুঃখ পেতেন এবং অপরের খুশিতে আনন্দিত হতেন।

তাঁর নিজস্ব জীবন যাত্রা ছিল খুবই সাদা-সিধে। তাঁর পোশাক ছিল কোরা ধুতি, প্রায় একই ধরনের কাপড়ের তৈরী গায়ের চাদর এবং চটি। ঐ একই পোশাকে তিনি গভর্নরের সাথেও দেখা করতে যেতেন এবং গরীবের সাথেও সাক্ষাৎ করতেন। তিনি ছিলেন প্রকৃত অর্থেই একজন ফকির, একজন সন্ন্যাসী অথবা সাধু। তাঁর জীবনের দিকে তাকানো আমাদের সকলেরই কর্তব্য। মেদিনীপুর জেলার একটা ছোট গ্রামে গরীব মাতা-পিতার সন্তান ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র। তাঁর মা ছিলেন একজন মহীয়যী রমনী এবং তাঁর বহু গুণাবলী ঈশ্বরচন্দ্র অর্জন করেছিলেন। এমনকি সেই সময়েও তাঁর বাবা বেশ কিছুটা ইংরেজী জানতেন এবং নিজের ছেলেকে উন্নতমানের শিক্ষা প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্রের বিদ্যালয় শিক্ষা শুরু হয় পাঁচ বছর বয়সে। আট বছর বয়সে, তাঁকে ষাট মাইল রাস্তা পায়ে হেঁটে কলকাতায় পৌঁছতে হয়েছিল সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হওয়ার জন্য। তাঁর স্মৃতি শক্তি এতটাই প্রখর ছিল যে, কলকাতায় আসার পথে রাস্তার ধারে পোঁতা পাথরের মাইল ফলকগুলি দেখে দেখে তিনি ইংরেজি সংখ্যামালা আত্মস্থ করে নেন। ষোল বছর বয়সেই তিনি সংস্কৃত ভাষায় যথেষ্ট বুৎপত্তি অর্জন করেন এবং সংস্কৃত শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হন। পরবর্তীতে ধাপে ধাপে উত্তীর্ণ হয়ে তিনি অবশেষে যে কলেজের ছাত্র ছিলেন সেই কলেজেরই অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। সরকারের কাছে তিনি ছিলেন বিশেষ সম্মানীয়। কিন্তু তাঁর স্বাধীনচেতা মানসিকতার জন্যই, শিক্ষা অধিকর্তার নির্দেশ মেনে চলা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না এবং তিনি তাঁর পদ থেকে ইস্তফা দেন। বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নর স্যার ফ্রেডরিক হ্যালিডে তাঁকে ইস্তফা পত্র প্রত্যাহারের জন্য অনুরোধ করেন, কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র সেই অনুরোধ এক কথায় প্রত্যাখ্যান করেন।

সরকারী চাকরি থেকে ইস্তফা দেওয়ার পরেই, তাঁর মহানুভবতা ও মানবিকতার প্রকৃত বিকাশ ঘটে। তিনি বুঝেছিলেন যে, বাংলা অত্যন্ত সুন্দর একটি ভাষা, কিন্তু চর্চা ও নতুন অবদানের অভাবে মলিন দেখাচ্ছে। তাই তিনি বাংলায় বই লিখতে শুরু করেন। তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বই লেখেন এবং প্রধানত বিদ্যাসাগরের জন্য আজ বাংলা ভাষার দ্রুত বিকাশ ঘটছে এবং সারা দেশে তা ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু তিনি এটাও বুঝেছিলেন যে, শুধু বই লিখলেই কাজ হবে না। তাই বিদ্যালয় স্থাপন করা শুরু করেন। বিদ্যাসাগরই কলকাতায় মেট্রোপলিটন কলেজ স্থাপন করেন। এখানে কর্মরত সমস্ত কর্মীরাই ভারতীয়। প্রাথমিক শিক্ষা উচ্চশিক্ষার মতনই গুরুত্বপূর্ণ, এটা উপলব্ধি করে তিনি দরিদ্রদের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয় চালু করেন। এটা ছিল একটি বিশাল কর্মযজ্ঞ এবং যার জন্য তাঁর সরকারী সাহায্যের প্রয়োজন ছিল। লেফটেন্যান্ট গভর্নর তাঁকে আশ্বস্ত করেছিলেন যে সরকার সাহায্য করবে। কিন্তু ভাইসরয় লর্ড এলিন বোরো এর বিরোধী ছিলেন এবং বিদ্যাসাগরের আবেদন না মঞ্জুর হয়। লেফটেন্যান্ট গভর্নর দুঃখ প্রকাশ করেন। তাঁকে ভাইসরয়ের বিরুদ্ধে মামলা করার পরামর্শ দেন। সাহসী বিদ্যাসাগর উত্তর দিয়েছিলেন, "মহাশয়, আমি কখনও আমার নিজের ন্যায়সঙ্গত অধিকারের স্বার্থে আদালতে যাইনি। তা এখন আমি কি করে আপনাদের বিরুদ্ধে আদালতে যাই?" ঐ সময় বেশ কিছু ইউরোপীয়ান সাহেব বিদ্যাসাগরকে প্রভূত আর্থিক সাহায্য করেন। যেহেতু তিনি নিজে বিশেষ অবস্থাপন্ন ছিলেন না, তাই প্রায়শই অন্যের বিপদে সাহায্য করতে গিয়ে দেনায় জড়িয়ে পড়তেন। এতদ্‌সত্ত্বেও তাঁর সাহায্যের জন্য যখন জনসাধারণের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহের প্রস্তাব এল, তিনি তৎক্ষণাৎ তা নাকচ করে দিলেন।

তিনি প্রাথমিক ও উচ্চ শিক্ষাকে দৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়েই সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি বুঝেছিলেন মেয়েদের শিক্ষা না দিয়ে শুধু ছেলেদের শিক্ষা দেওয়াটাই যথেষ্ট নয়। তিনি 'মনু'র একটি শ্লোক উদ্ধৃত করে দেখান 'স্ত্রী শিক্ষা' একটি কর্তব্য। একে কাজে পরিণত করার জন্য তিনি একটি বই লেখেন এবং শ্রীযুক্ত বেথুনের সহযোগিতায় স্ত্রী শিক্ষার জন্য বেথুন কলেজ স্থাপন করেন। কিন্তু স্ত্রী শিক্ষার জন্য কলেজ স্থাপনের থেকেও কঠিন কাজ ছিল, তাঁদের কলেজে পাঠানো। যেহেতু তিনি ছিলেন অতীব বিদ্বান এবং সহজ সরল জীবন যাপন করতেন, তাই সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন। তাই তিনি সেই সময়কার গণ্যমান্য লোকেদের সাথে যোগাযোগ করেন এবং তাঁদের পরিবারের মহিলাদের কলেজে পাঠানোর জন্য অনুরোধ করেন। এই ভাবেই তাঁদের কন্যারা কলেজে যাতায়াত শুরু করেন। এখন ঐ কলেজে বহু প্রথিতযশা এবং গুণী ও আকর্ষণীয় চরিত্রের মহিলারা রয়েছেন, যাঁরা নিজেরাই প্রশাসন পরিচালনায় সক্ষম। এতেও তৃপ্ত না হয়ে তিনি শিশু কন্যাদের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন শুরু করেন। এখানে খাবার, পোশাক এবং পুস্তক বিনামূল্যে প্রদান করা হত। এর ফলশ্রুতি হল, আজ কলকাতায় হাজার হাজার শিক্ষিত মহিলার দেখা মিলবে।

উপযুক্ত শিক্ষকের চাহিদা মেটানোর জন্য তিনি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ চালু করেন। হিন্দু বিধবাদের শোচনীয় অবস্থা প্রত্যক্ষ করে তিনি বিধবাদের পুনর্বিবাহের পক্ষে কথা বলতে শুরু করেন। তিনি এই বিষয়ে বই লেখা ও প্রচারের কাজ শুরু করেন। তিনি নিজের ছেলেকেও উৎসাহিত করেছিলেন একজন গরীব বিধবাকে বিবাহ করার জন্য। কুলীন বা উচ্চবংশীয় ব্রাহ্মণদের একাধিক বিবাহের অধিকার ছিল। এমনকি কুড়িটি বিয়ে করেও তাদের কোন লজ্জা ছিল না। এই সমস্ত মহিলাদের কষ্ট দেখে ঈশ্বরচন্দ্র কেঁদে ফেলতেন এবং তিনি এই ঘৃণ্য প্রথা বাতিলের জন্য জীবনের শেষ পর্যন্ত লড়াই করে গেছেন।

বর্ধমানে হাজার হাজার গরীব মানুষ ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত দেখে তিনি নিজের খরচায় চিকিৎসক নিয়ে যান এবং নিজের হাতে তাঁদের মধ্যে ওষুধ বিতরণ করেন। তিনি গরীবদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে, তাদের সাহায্য করতেন। এইভাবে টানা দু'বছর কাজ করার পর তিনি সরকারী সাহায্য পান এবং আরও ডাক্তার নিয়ে সেখানে যান। এই কাজ করতে গিয়ে তিনি উপলব্ধি করেন যে ওষুধ সম্পর্কে কিছু জ্ঞান থাকা আবশ্যক। তাই হোমিও প্যাথি শিক্ষা করে যথেষ্ট বুৎপত্তি লাভ করেন এবং অসুস্থদের জন্য ওষুধ লিখতে শুরু করেন। গরীবদের সাহায্য করার জন্য বহু দূর পথ যেতেও তাঁর আপত্তি ছিল না। এমনকি ডাক সাইটে লোকেদেরও সাহায্য করতেও তাঁর দ্বিধা ছিল না। যদি এই ধরনের কেউ অবিচারের শিকার হয়ে দারিদ্রে নিমজ্জিত হতেন, ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর প্রতিপত্তি, জ্ঞান ও অর্থ দিয়ে সাহায্য করে তার দুঃখ নিবারণ করতেন। এই ধরনের কাজ করতে করতেই বিদ্যাসাগর সত্তর বছর বয়সে ১৮৯০ সালে মারা যান। এই পৃথিবীতে তাঁর মতন মানুষ খুব বেশী নেই। এটা বলা হয় যে, বিদ্যাসাগর যদি ইউরোপে জন্মগ্রহণ করতেন, তাহলে ব্রিটিশরা নেলসনের জন্য যেমন স্মারক সৌধ নির্মাণ করেছে, তেমনই তাঁর জন্যও স্মৃতি স্তম্ভ নির্মিত হত। যদিও বাংলার জ্ঞানী-গুনী থেকে সাধারণ মানুষ, ধনী থেকে দরিদ্র সকলের হৃদয়েই বিদ্যাসাগরের স্মৃতি সৌধ নির্মিত হয়ে আছে। এর থেকেই স্পষ্ট হয় কিভাবে বাংলা ভারতের অন্যান্য অংশকে পথ দেখায়। □

(ইন্ডিয়ান ওপিনিয়ন; ১৬.৯.১৯০৫)

অনুবাদ ঃ সুমিত ভট্টাচার্য

বিদ্যাসাগরের নাস্তিকতা

সমরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু

বিদ্যাসাগর নাস্তিক ছিলেন কি না- এ প্রশ্ন উত্থিত হয়েছে তাঁর সময়কাল থেকে, কিন্তু এর কোন সন্তোষজনক উত্তর মেলেনি আজও। এ প্রশ্নটি যেন আবৃত হয়ে আছে রহস্যের ধূম্রজালে। সেক্সপীয়র সম্বন্ধে প্রযুক্ত ম্যাথু আর্নল্ড-এর উক্তি উদ্ধৃত করে বিদ্যাসাগর মানসের এই আধ্যাত্ম-চেতনার দিকটি সম্পর্কে আমরাও যেন বলতে পারি তাঁকে উদ্দেশ্য করে:

"We ask and ask– Thou smilest and art still, out-tapping knowledge!" আভিধানিক সংজ্ঞা অনুসারে নাস্তিক হলেন সেই ব্যক্তি যিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব, বেদ ও পরকাল স্বীকার করেন না। গুণানুসারে নাস্তিকদের আবার ছয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে, যথা, মাধ্যমিক, যোগাচার, সৌত্রান্ত্রিক, বৈভাষিক, চার্বাক ও দিগম্বর।

সংস্কারের এই কষ্টিপাথরে বিচার করলে বিদ্যাসাগরের নাস্তিকতা নির্ণীত হয় কি না এবং হলেও তিনি কোন শ্রেণীতে পড়েন- এ ধরনের কূট তর্ক বা সূক্ষ্ম তত্ত্ব আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের লক্ষ্য নয়। সাধারণভাবে বিদ্যাসাগরের ধর্ম্মবিশ্বাস সম্বন্ধে একটি সঠিক ধারণায় উপনীত হওয়াই এর উদ্দেশ্য।

বিদ্যাসাগরের ধর্ম্মমত নিয়ে এত জল্পনা-কল্পনার উদ্ভব হওয়ার মূলে রয়েছে এ সম্পর্কে তাঁর নিজের বিস্ময়কর নীরবতা। শ্রীযুক্ত বিনয় ঘোষ তাঁর "বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ" গ্রন্থে লিখেছেন : "জীবনে একটি বারের জন্যও তিনি ধর্ম বিষয়ে প্রকাশ্যে আলোচনা করেননি। ঘরোয়া বৈঠকেও না।" এ বিষয়টি সম্বন্ধে তাঁর যেটুকু মন্তব্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে প্রকাশ পেয়েছে তা' অধিকাংশই লঘু হাস্য-পরিহাস, শ্লেষ ও ব্যঙ্গোক্তির মাধ্যমে। তাই এইসব মন্তব্য ও টিপ্পনীকে অযথা গুরুত্ব দিয়ে তাঁর সত্যকার মত বলে মেনে নেওয়া সমীচীন হতে পারে না। মুস্কিলটা এখানেই।

তত্ত্ব অপেক্ষা তথ্য শ্রেয়, - তাই তাঁর জীবন-কাহিনী থেকে প্রাসঙ্গিক কয়েকটি উদাহরণের উল্লেখ নিঃসন্দেহে আলোকপাত করবে আলোচ্য বিষয়টির ওপর।

একবার এক বন্ধুর বাড়িতে বারান্দায় বসে শিবনাথ শাস্ত্রী ও অন্যান্য কয়েকজন পরিচিত লোকের সঙ্গে গল্প করছেন বিদ্যাসাগর, এমন সময় সেখান দিয়ে এক বাঙালী খ্রীষ্টান-পাদ্রী যাচ্ছিলেন। সেখানে উপস্থিত কয়েকজন বালককে সেই পাদ্রি ভদ্রলোক যীশুখ্রীষ্ট ভজন করলে কি-ভাবে Salvation বা মুক্তি মেলে তা' বোঝাতে প্রবৃত্ত হলেন। সকৌতুক কৌতুহলে কিছুক্ষণ সেই Sermon বা ধর্ম্মোপদেশ শোনবার পর বিদ্যাসাগর তাঁকে ডেকে বললেন : " ও বেচারাদের ছেড়ে দিন মশাই, ওরা নিতান্ত বালক, ওদের Salvation এর কথা চিন্তা করবার অনেক সময় আছে এখনও। তার চেয়ে বরং আমাকে বোঝান, আমার বয়স হয়েছে, আজ বাদে কাল মরব।" খ্রীষ্টানধর্ম্মে দীক্ষাগ্রহণেচ্ছু একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি পাওয়া গেছে ভেবে সেই বাঙালী পাদ্রি-সাহেব তো পরম উৎসাহে তাঁকে বোঝাতে আরম্ভ করলেন যীশু-মাহাত্ম্য। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই বিদ্যাসাগরের শ্লেষ আর বিদ্রূপের বাণে বিদ্ধ হয়ে তাঁকে অনন্ত নরক বাসের অভিশাপ দিতে দিতে সে-স্থান ত্যাগ করলেন।

শশীভূষণবাবু নামে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের একজন প্রচারক সিটি কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ হেরম্ব মৈত্রের বৃদ্ধ পিতা চাঁদমোহন মৈত্রকে বিদ্যাসাগরের বাড়ীতে নিয়ে যাবার জন্যে বাদুরবাগানে তাঁর বাড়িরই আশে-পাশে বহুক্ষণ ঘোরাঘুরি করেন, কিন্তু কিছুতেই বাড়ী খুঁজে পান না। পরে মৈত্র মশাই নিজেই অনুসন্ধান করে বিদ্যাসাগরের বাড়ি বার করেন এবং তাঁকে ঘটনাটি বলেন। বিদ্যাসাগর যখন জানতে পারলেন যে পথ-প্রদর্শক শশীভূষণ বাদুড়বাগানেই বাস করেন তখন তাঁর আর বিস্ময়ের সীমা রইলো না। তিনি তাঁকে ডেকে বললেন : "এত কাছে বাস করেও তুমি বুড়ো মানুষকে আমার বাড়িতে আনতে এত বেগ দিয়েছ, তবে তুমি মানুষকে কি করে পরলোকের পথ দেখাচ্ছ? এখানে থেকে এখানেই যখন তোমার এত গোলোযোগ, তখন তুমি কি করে সেই অজানা পথে লোক চালান দাও? তুমি বাপু ও ব্যবসা ত্বরায় ত্যাগ কর, ও তোমার কর্ম্ম নয়।"

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ধর্ম্ম-প্রচারকের ব্রত গ্রহণ করলে তিনি শ্লেষোক্তি করেন : "তুমি নাকি কি একটা হয়েছ?"

নানা দেশের অসংখ্য নরনারী সমেত "স্যার জন লরেন্স্" নামে ষ্টিমারখানি জলমগ্ন হলে তিনি গভীর মনস্তাপ সহকারে বলেছিলেন : "দুনিয়ার মালিক কি আমাদের চেয়ে নিষ্ঠুর যে নানা দেশের অসংখ্য লোককে একত্র ডোবালেন! আমি যা পারি না, তিনি পরম কারুণিক মঙ্গলময় হয়ে কেমন করে এই ৭০০/৮০০ লোককে একত্র এক সময় ডুবিয়ে ঘরে ঘরে শোকের আগুন জ্বেলে দিলেন? দুনিয়ার মালিকের কি এই কাজ? এসব দেখলে কেউ মালিক আছেন বলে বোধ হয় না।"

রবীন্দ্রনাথ তাঁর "বিদ্যাসাগর চরিত"-এ একটি ঘটনার কথা লিখেছেন : "বিদ্যাসাগর পিতৃদর্শনে কাশীতে গমন করিলে সেখানকার অর্থলোপুপ কতকগুলি ব্রাহ্মণ তাঁহাকে টাকার জন্য ধরিয়া পড়িয়াছিল। বিদ্যাসাগর তাহাদের অবস্থা ও স্বভাব দৃষ্টে তাহাদিগকে দয়া অথবা ভক্তির পাত্র বলিয়া জ্ঞান করেন নাই, সেইজন্য তৎক্ষণাৎ অকপট চিত্তে উত্তর দিলেন — 'এখানে আছেন বলিয়া আপনাদিগকে যদি আমি ভক্তি বা শ্রদ্ধা করিয়া বিশ্বেশ্বর বলিয়া মান্য করি, তাহা হইলে আমার মত নরাধম আর নাই।" ইহা শুনিয়া কাশীর ব্রাহ্মণেরা ক্রোধান্ধ হইয়া বলেন, 'তবে অপনি কি মানেন?" বিদ্যাসাগর উত্তর করিলেন- "আমার বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা উপস্থিত এই পিতৃদেব ও জননীদেবী তে বিরাজমান।'

অগ্রজপ্রতিম বিদ্যাসাগরের স্নেহচ্ছায়ায় বর্দ্ধিত- সেকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মণীষী- কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য "পুরাতন প্রসঙ্গ" নামক পুস্তকে বিদ্যাসাগরের ধর্ম্মবিশ্বাস বিষয়ে বলেছেন : "বিদ্যাসাগর নাস্তিক ছিলেন একথা বোধ হয় তোমরা জাননা; যাঁহারা জানিতেন, তাঁহারা কিন্তু সে বিষয় লইয়া তাঁহার সঙ্গে কখনও বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইতেন না; কেবল রামমোহন রায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র রাধাপ্রসাদ রায়ের দৌহিত্র ললিত চাটুয্যের সহিত তিনি পরলোকতত্ব লইয়া হাস্য-পরিহাস করিতেন।"

সাহিত্য-সাধক চরিতমালায় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন যে, একসময় বেদান্তকে ভ্রান্তদর্শন বলিতেও কুণ্ঠিত হননি বিদ্যাসাগর।

ঈশ্বর, পরকাল ও বেদ সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের মনোভাবের এইসব সাক্ষ্য নিঃসন্দেহে তাঁর নাস্তিকতার প্রতিপাদক- অন্ততঃ উপরোক্ত অভিধানিক সংজ্ঞা অনুসারে তো বটেই! কিন্তু বিষয়টি গূঢ় ও জটিল এবং সেই হেতু এটি তাঁর সমগ্র জীবনের চিন্তা ও কর্ম্মধারার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার্য্য—কেবলমাত্র অসংলগ্ন ও বিক্ষিপ্ত কয়েকটি উক্তির নিকষে নয়।

বিদ্যাসাগর-চরিত্র বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট হয়ে ওঠে তার দুটি বৈশিষ্ট্য- আর এই দুটিই হল 'রেনেসাঁস' বা 'নবজাগরণ'-এরও প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্য দুটি হল মানবমুখিনতা (Humanism) আর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র (Individualism)। চরিত্রের এই দুটি মৌলিক গুণ বিদ্যাসাগরের সারা জীবনের চিন্তা ও আচরণকে প্রভাবিত ও পরিচালিত করেছে। বিদ্যাসাগর চরিত্রের সম্যক উপলব্ধির জন্যে তাই রেনেসাঁস বা নবজাগরণের তাৎপর্য ও স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করা আবশ্যক।

মানুষের মন মধ্যযুগীয় কুসংস্কার ও প্রথার অন্ধ দাসত্ব তেকে মুক্তিলাভ করে একদিন যুক্তি ও বিচারবুদ্ধির আলোকে ধীরে ধীরে নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছিল। মোহাচ্ছন্ন ও জড়ত্বপ্রাপ্ত মনের এই জাগৃতিই 'রেনেসাঁস' বা 'নবজাগরণ' রূপে ইতিহাসে আখ্যাত। ইওরোপে এই রেনেসাঁসের সূত্রপাত হয় ইতালীয় ফ্লোরেন্স নগরীতে, আনুমানিক খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাবে। তারপর তার তরঙ্গ ক্রমে বিস্তৃত হয় জার্ম্মানী, ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডে। এই রেনেসাঁসের ঢেউ ভারত-তটে এসে উপনীত হয় ঊনবিংশ শতাব্দীতে। একদিকে পাশ্চাত্য সাহিত্য ও দর্শনের ব্যাপক অনুশীলন ও অন্যদিকে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি আন্তরিক অনুরাগ শিক্ষিত ও বিদগ্ধ মনে জাগালো নতুন প্রেরণা ও উদ্দীপনা। "তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশি" বিচারের যে স্রোতঃপথ গ্রাস করে ফেলেছিল, তার থেকে জাগরিত হল ভারতীয়-মানস- এই "নূতন যুগের ভোরে।"

উনিশ শতকের এই নবজাগরণে বাংলাদেশ নিয়েছিল অগ্রণী ভূমিকা। ধর্ম্ম, শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে নতুন আদর্শ ও চিন্তাধারার বিচিত্র প্রকাশ ঘটেছিল এই দেশে, এই কালে। বাংলার নবযুগের এই নবজাগরণে যে-সব মনীষীর অবদান অগ্রগণ্য, বিদ্যাসাগর তাঁদের মধ্যে অন্যতম। রামমোহনের পর নবজাগরণের ভাবধারা তাঁর মধ্যে দিয়েই বিকাশ ও প্রকাশ লাভ করেছিল। রেনেসাঁস বা নবজাগরণের ভিত্তিমূল প্রতিষ্ঠিত ছিল Individualism বা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্রবাদ এবং Humanism বা মানবমুখিনতার ওপর। মধ্যযুগের চিন্তাধারা ছিল ঈশ্বর ও ধর্ম্মকেন্দ্রিক, সুতরাং রেনেসাঁস যুগের এই মানব- কেন্দ্রিক ও ইহজগত-কেন্দ্রিক চিন্তাধারা নিঃসন্দেহে বৈপ্লবিক বলে অভিহিত ও অভিনন্দিত হবার যোগ্য। মানবজীবনের মহত্ব ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা এবং স্বাধীন চিন্তার মূল্য স্বীকার করাই এই নবজাগরণের ভাবাদর্শ।

▶▶ নবম পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমে

রেনেসাঁ, নবজাগরণ ও বিদ্যাসাগর

সুমিত ভট্টাচার্য

বাংলার নবজাগরণের অন্যতম প্রাণপুরুষ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দ্বিশততম জন্মবার্ষিকীর সূচনা হল ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষ থেকে এই মহান চিন্তানায়কের দ্বিশততম জন্মবার্ষিকী যথোপযুক্ত গুরুত্বসহকারে প্রতিপালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। বিভিন্ন জেলা-অঞ্চল, অন্তর্ভুক্ত ও সহযোগী সমিতিগুলি আগামী এক বছর বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে তাঁর কীর্তিকে স্মরণ করবে। সংগ্রামী হাতিয়ারের এই সংখ্যাটিতে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে চারটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।। যা আগামীদিনে বিদ্যাসাগর চর্চায় পাঠকদের উৎসাহিত করবে বলে আশা রাখি।

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি
কেন্দ্রীয় কমিটি

ঊনবিংশ শতাব্দীতে আমাদের দেশে, বিশেষত অবিভক্ত বাংলায় একাধারে আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার ও সমাজ সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ডের যে উপুর্যপরি ঢেউ উঠেছিল সেগুলিকে একত্রে নবজাগরণের পর্ব হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। আবার যে সমস্ত চিন্তানায়কদের অসামান্য ভূমিকায় এই পর্বটি আলোকিত হয়ে রয়েছে, তাঁদের নব জাগরণের প্রাণ পুরুষ বলা হয়ে থাকে। তৎকালীন ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশে এই নবজাগরণের কম্পন অনুভূত হলেও, নিঃসন্দেহে এর এপি-সেন্টার ছিল বঙ্গপ্রদেশ। আবার বঙ্গ প্রদেশেই মূলত তৎকালীন সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও বৌদ্ধিক স্তরে যে উথাল-পাথাল ঘটেছিল, তাকে পঞ্চদশ শতাব্দীর ইউরোপীয় রেনেসাঁর অনুকরণে 'নবজাগরণ' নামে আখ্যায়িত করার চল রয়েছে। পাশাপাশি ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা, আর পঞ্চদশ শতাব্দীর ইউরোপের আলোক প্রাপ্তির আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বাস্তবতার মিল কোথায়, আর অমিলই বা কতটুকু, তা নিয়ে চর্চাও রয়েছে। রেনেসাঁ পর্বের যাঁরা চিন্তানায়ক তাঁদের ভূমিকা, আর নবজাগরণের যাঁরা পথিকৃৎ তাঁদের চিন্তা ও কাজের তুলনামূলক আলোচনারও প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

বিদ্যাসাগর ছিলেন, বাংলা তথা ভারতের নবজাগরণের অন্যতম অগ্রণী প্রতিনিধি। স্বভাবতই তৎকালীন আর্থসামাজিক বাস্তবতায় তাঁর আলোড়ণ সৃষ্টিকারী ভূমিকা সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলার আগে, রেনেসাঁ ও নবজাগরণ সম্পর্কে দু-একটি কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন। কারণ সমকালিন বাস্তবতাকে উহ্য রেখে, কোন মহান চিন্তানায়কের ভূমিকার সঠিক মূল্যায়ণ করা সম্ভব হয়না।

রেনেসাঁ ও নবজাগরণ

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় নবজাগরণের ভিত্তিভূমি ছিল প্রধানত দুটি---(১) চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কেন্দ্রীক ভূমি অর্থনীতি এবং (২) ঔপনিবেশিক শাসনের রাজনৈতিক-প্রশাসনিক কাঠামো। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কারণে তৎকালীন বাংলাদেশে আর্থিক প্রতিপত্তিসম্পন্ন এক নতুন জমিদারশ্রেণীর গঠন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। পাশাপাশি ঔপনিবেশিক প্রশাসনিক কাঠামো, তার নিজস্ব প্রয়োজনেই, এ দেশের মানুষের কাছে প্রশাসনের কাজে যুক্ত হওয়ার, অর্থাৎ চাকুরিজীবী হওয়ার একটা সুযোগ এনে দিয়েছিল। কিন্তু এই সুযোগ গ্রহণ করার জন্য প্রয়োজন ছিল ইংরেজি শিক্ষার। স্বভাবতই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে উপকৃত, সমাজে প্রতিপত্তিশালী জমিদার শ্রেণীর প্রতিনিধিদের একাংশ আর্থিক স্বচ্ছলতা, সামাজিক প্রতিপত্তি ও ইংরেজ শাসকদের সাথে ইতোমধ্যে গড়ে ওঠা ঘনিষ্ঠতার কারণে ইংরাজি শিক্ষা তথা বিজ্ঞান নির্ভর পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে সুবিধাজনক অবস্থানে ছিল। রাজা রামমোহন রায়, প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রমুখ ছিলেন একাধারে নবউত্থিত জমিদার শ্রেণী ও নব্য শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের প্রতিনিধি। বিদ্যাসাগরের অবস্থান ছিল ব্যতিক্রমী। কারণ তিনি দরিদ্র-নিম্নবিত্ত পরিবার থেকে উঠে এসেছিলেন। একই কথা বলা যেতে পারে অক্ষয় কুমার দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র বা হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে। Exception proves the rule—এখানেও ব্যতিক্রম সাধারণ প্রবণতাকে প্রতিষ্ঠিত করে।

নবগঠিত জমিদারশ্রেণী ও নব-উত্থিত মধ্যবিত্ত সমাজের এই আন্তঃসম্পর্কই 'নবজাগরণ' ও 'রেনেসাঁর' একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রভেদ রচনা করেছে। কেন ও কিভাবে সে বিষয়ে দু-একটি কথা বলা প্রয়োজন। ইউরোপীয় রেনেসাঁর সূচনা হয় পঞ্চদশ শতাব্দীর ইতালিতে। সেই সময়টা ছিল সে দেশে সামন্ততন্ত্রের অবক্ষয় ও বাণিজ্যিক পুঁজিবাদ বা মার্কেন্টাইল ক্যাপিটালিজমের যুগ। এই বাণিজ্যিক বুর্জোয়ারাই ছিল শিল্প বুর্জোয়াদের প্রাথমিক রূপ। সামন্ততন্ত্রের সাথে এদের কোন সম্পর্ক না থাকার ফলে, সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে নিজেরা যেমন শ্রেণীগতভাবে বিরোধিতা করেছিল, তেমনই সামন্তশোষণের বিরুদ্ধে কৃষক সমাজাকে সংগঠিত করে ধীরে ধীরে বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের ভিত্তি রচনা করেছিল। কিন্তু বাংলার নব জাগরণের প্রেক্ষিত সম্পূর্ণ ভিন্ন। এখানে যঁরা ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে চাকুরীজীবী হলেন, তাঁদের প্রায় সকলেরই (উপরে উল্লিখিত কতিপয় ব্যক্তি বাদ দিয়ে) অরিজিন বা উৎস ছিল জমিদার শ্রেণী। ফলে সামন্ত প্রভুদের সাথে তাঁদের কোন বৈরীতা ছিল না। কৃষক সমাজের প্রতিও তাঁদের সাধারণভাবে কোন দুর্বলতা ছিল না। এমনকি যাঁরা চাকরি না করে ব্যবসার দিকে ঝুঁকেছিলেন, তাঁরাও ইংরেজ বণিকদের প্রসাদের আনুকূল্য নিয়ে 'কম্প্রাডর' বা মুৎসুদ্ধী বুর্জোয়া হিসেবে নিজেদের গড়ে তুলেছিলেন। উদাহরণ প্রিন্স দ্বারাকানাথ ঠাকুর।

একমাত্র ঔপনিবেশিক শাসন প্রক্রিয়া যখন, জমিদারতন্ত্রের স্বার্থকেও কিছুটা হলেও ক্ষুণ্ণ করেছে, তখনই কৃষকদের প্রতি সহমর্মিতার প্রকাশ লক্ষ্য করা গেছে। যেমনটা দেখা গেছিল নীলকর সাহেবদের নীলচাষের ক্ষেত্রে। তাই নীল বিদ্রোহকে শহরে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের একাংশ সমর্থন করেছিলেন। তবে তা কখনই বৃটিশ রাজশক্তির সামগ্রিক শাসন ও শোষণকে উচ্ছেদের লক্ষ্যে পরিচালিত হয়নি। ঔপনিবেশিক শাসনক বিরোধী জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমের যে স্ফুরণ বিংশ শতাব্দীর বাংলায় তথা সারা দেশে পরিলক্ষিত হয়েছিল, ঊনবিংশ শতাব্দীর নব জাগরণের প্রতিভূয়োর মধ্যে কিন্তু সেই উপাদান ছিল না। রাজা রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্ন ঠাকুর প্রমুখ নব জাগরণের প্রতিনিধিরা ১৮২৯ সালে কলকাতার টাউন হলে সমবেত হয়ে বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসন (তখনও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন ছিল) পাকাপাকিভাবে স্থাপনের জন্য আবেদন করেছিলেন। এমনকি রামমোহন রায় নিজে ১৮৩২ সালে হাউস অব কমন্সের কাছে এই মর্মে আবেদন করেন।

ইউরোপের বাণিজ্যিক বুর্জোয়ারা নিজের নিজের দেশে ছিলেন স্বাধীন ব্যবসায়ী। যাঁরা কোন বৈদেশিক শাসনের শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিলেন না। পাশাপাশি, বিজ্ঞানের অগ্রগতির হাত ধরে উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ ঘটতে শুরু করে। বর্ধিত উৎপাদিকা শক্তিকে ব্যবহার করে বাণিজ্যিক পুঁজি শিল্প পুঁজিতে রূপান্তরিত হয়। অর্থাৎ পুঁজিবাদী ব্যবস্থার গোড়াপত্তন হয়। পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা নিজ শ্রেণী স্বার্থে সামন্ততান্ত্রিক শাসন কাঠামোকে ভেঙ্গে এক নতুন ধরনের রাষ্ট্রকাঠামোর চর্চা শুরু করে। স্বভাবতই ইউরোপীয় রেনেসাঁর এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ছিল রাজনৈতিক বা রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তা। উনিশ শতকের বাংলার নব জাগরণের প্রেক্ষিত ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। ঔপনিবেশিক শাসনে আবদ্ধ এই দেশে ঐ সময়ে জাতীয় বুর্জোয়াদের স্বাধীন বিকাশ ঘটেনি। ফলে নবজাগরণের এক দীর্ঘ সময় জুড়ে, কোন রাজনৈতিক উপাদান পরিলক্ষিত হয় না।

ইউরোপে রেনসাঁর সমান্তরালে শুরু হয়েছিল, অপেক্ষাকৃত কম অলোচিত রিফর্মেশন আন্দোলন। এই রিফর্মেশন আন্দোলনের ঘোষিত লক্ষ্য ছিল খ্রীস্ট ধর্মের সংস্কারের মাধ্যমে, একে চার্চের কঠোর অনুশাসন থেকে মুক্ত করে একটা সর্বজনীন রূপ প্রদান করা। অনেকটা আমাদের দেশের সুফী ধর্ম আন্দোলনের মতই। রেনেসাঁ ও রিফর্মেশন আন্দোলন দুটি সমান্তরাল ধারায় প্রবাহিত হয়েছিল। রেনেসাঁর রাষ্ট্রকে চার্চের নিয়ন্ত্রণমুক্ত করার উদ্যোগ এবং রিফর্মেশন আন্দোলনের চার্চের ধর্মীয় অনুশাসনকে লঘু করার প্রচেষ্টা একে অপরের পরিপূরক ভূমিকা পালন করেছিল। এই দুই ধারার মিলনের অবশ্যম্ভাবী ফল ছিল দর্শনের ক্ষেত্রে বস্তুবাদের চর্চার প্রসার, বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা লব্ধ ফলাফলের উপর নির্ভর করা ও তাকে ব্যবহার করা এবং এক মানবতাবাদী সংকৃতির বিকাশ।

রেনেসাঁ ও রিফর্মেশন আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন দুটি সম্পূর্ণপৃথক গোষ্ঠী। এইদুই আন্দোলন একেঅপরের পরিপূরক হলেও, উভয় আন্দোলনের নেতারাই কিন্তু নিজেদের পরিধির মধ্যে থেকেই কাজ করেছেন। রেনেসাঁর নেতৃত্বে ছিলেন মুর, ক্যান প্যাবেলা প্রমুখ আর রিফর্মেশনের নেতৃত্বে ছিলেন মার্টিন ল্যুথার, ক্যালভাঁ প্রমুখ ধর্মীয় নেতাগণ। এর মানে অবশ্য এটা নয় যে, রেনেসাঁর নেতারা সকলেই ধর্ম সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন। তা নয়, কিন্তু তাঁদের রাষ্ট্র ও সমাজ সম্পর্কিত চিন্তায় নিয়ন্ত্রক ছিল যুক্তি ও বিজ্ঞান, ধর্ম নয়।

বাংলার নবজাগরণের সমস্ত প্রতিনিধিরাই ধর্মীয় চিন্তামুক্ত ছিলেন একথা বলা যাবে না। এমনকি অনেকের ক্ষেত্রেই ধর্মীয় চিন্তাই সমাজ সম্পর্কে তাঁদের ধারণাকে নিয়ন্ত্রণ করত। এমনকি পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার পরেও, তাঁরা দীর্ঘদিন নিরবলম্ব থাকতে পারেননি। কারও খ্রীস্ট ধর্মের প্রতি (ইয়ং বেঙ্গলের বহু সদস্য খ্রীস্ট ধর্ম গ্রহণ করেন)। কারও ব্রাহ্ম ধর্মের প্রতি (রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখ)। আবার কারও কারও প্রচলিত হিন্দু ধর্মের প্রতি (বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণ) আস্থা ফিরেছিল। এদিক থেকেও বিদ্যাসাগর ছিলেন ব্যতিক্রম। তাঁর সমাজ চিন্তায় ধর্মের কোনো স্থান ছিল না। ধর্মের স্থান ছিল না বলেই, তিনি কখনও তাঁর পূর্বসুরী বা সমসাময়িক আরও অনেকের মতন ধর্মের জন্য বা ব্রাহ্মণের জন্য দান করেননি। তিনি সাধ্যাতীত দান করেছেন, নিজে দেনা করেও দান করেছেন, কিন্তু তা করেছেন দুঃস্থ দরিদ্রদের সাহায্য করার দৃষ্টিভঙ্গী থেকে। নব জাগরণের বহু প্রতিনিধি ছিলেন, যাঁদের সমাজ সংস্কারের চিন্তা ধর্ম ও শ্রেণী চেতনার বাইরে বেরোতে পারেনি। বিদ্যাসাগর ধর্মীয় চেতনামুক্ত তো ছিলেনই, শ্রেণীগতভাবেও জন্মসূত্রে তাঁর অবস্থান ছিল দরিদ্র পরিধিতে। পরবর্তী পর্বেও, বিপুল পাণ্ডিত্য, উন্নতমানের চাকুরি, সমাজের অভিজাতদের সাথে সখ্যতা সত্ত্বেও, জন্মসূত্রে প্রাপ্ত শ্রেণীবোধ থেকে কখনও বিচ্যুত হননি। বিদ্যাসাগরের এবংবিধ কর্মকাণ্ডকে যদি মানবহিতৈষণা বলা হয়, তাহলে এই মানবহিতৈষণা 'নবজাগরণের' অন্যতম প্রধান উপাদান ছিল। এদিক থেকে 'রেনেসাঁ'-র সাথে এর একটা মিল রয়েছে। এখানেও কোন কোন বিশেষজ্ঞ কিছুটা পার্থক্য খুঁজে পান। যেমন পাশ্চাত্যের মানবহিতৈষনার বা ফিলানথ্রপির একটা বড় বৈশিষ্ট ছিল কারণ অনুসন্ধান করা। কিন্তু নবজাগরণের ফিলানথ্রপি কিন্তু কারণ অনুসন্ধানে খুব বেশী উৎসাহী ছিল না। এখানে ফলের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হত। যেমন নারীদের দুর্দশা মোচনে সতীদাহ প্রথা নিবারণ, বিধবা বিবাহ প্রচলন প্রভৃতি।

বাংলার নবজগরণের পর্বভিত্তিক বা চিন্তানায়ক ভিত্তিক কোন ক্রমতালিকা প্রস্তুত করা হয়, তাহলে প্রথম নাম যদি হয় রাজা রাজমোহন রায়ের, তাহলে দ্বিতীয় ব্যক্তি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। এই কারণে অনেক সময় তাঁকে রামমোহনের উত্তরসূরী বলা হয়। কিন্তু উত্তরসূরী বলতে কর্ম ও চিন্তায় যে একাত্মতা বোঝায়, সেই অর্থে রামমোহনের উত্তরসূরী বিদ্যাসাগর ছিলেন না। কারণ রামমোহনের সমাজ সংস্কারের ভাবনা ধর্ম থেকে বিযুক্ত ছিল না। কিন্তু বিদ্যাসাগরের সমাজ সংস্কারের ভাবনা ছিল ধর্ম থেকে বিযুক্ত। বরং এদিক থেকে বিদ্যাসাগরের অনেক কাছাকাছি থাকবে ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠী। বেদান্তের ব্যাখ্যা নিয়ে ব্রহ্মান্যবাদীদের সাথে রামমোহন রায়ের মত পার্থক্য ছিল। কিন্তু বিদ্যাসাগরের মত বেদান্ত দর্শনকে তিনি ভ্রান্ত দর্শন বলতে পারেননি। পাঠ্যসুচী সম্পর্কেও এই দুই মহানায়কের চিন্তা পদ্ধতির পার্থক্য ছিল। রামমোহন, ব্যালেন্টাইন প্রমুখ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় দর্শনের ওপর জোর দিতেন। কিন্তু বিদ্যাসাগরের স্পষ্ট অভিমত ছিল, দেশীয় ভাষায় পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শনের পাঠ। এক কথায় বলা যায় যে, নবজাগরণের নক্ষত্রমণ্ডলীতে বিদ্যাসাগর ছিলেন স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। □

ষষ্ঠ পৃষ্ঠার পর

৬ষ্ঠ বেতন কমিশন

মহার্ঘভাতা দিতে হলে অভিরুপবাবুর হিসেব অনুযায়ী সরকারকে বছরে ১৫০০ কোটি টাকা বাড়তি খরচ করতে হবে। যা ২০১৪-১৫ সালের হিসেব অনুযায়ী রাজ্যের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ১·৯ শতাংশ। একই বছরে উৎপাদনের অনুপাতে পশ্চিমবঙ্গের মোট এবং প্রাথমিক খরচ যথাক্রমে ছিল ১৫ শতাংশ এবং ১২·৩ শতাংশ। উৎপাদনের অনুপাতে মোট এবং প্রাথমিক খরচের নিরিখে ১৮টি রাজ্যের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের স্থান যথাক্রমে ১৫ এবং ১৬। অর্থাৎ খরচ করার নিরিখে পশ্চিমবঙ্গ অন্য রাজ্যের তুলনায় পিছিয়ে রয়েছে, কেন? খরচ করার মতো টাকা সরকার আয় করতে পারছে না। অন্য রাজ্যের তুলনায় বাংলায় নিজস্ব কর আদায়ের পরিমাণ অত্যন্ত কম। ২০১৪-১৫ সালে নিজস্ব কর আদায়ের পরিমাণের নিরিখে দেশের ১৮টি মুখ্য রাজ্যের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের স্থান ছিল সর্বনিম্ন, ১৮ নম্বরে। এই ব্যর্থতার অন্যতম কারণ হলো সংগঠিত শিল্পের অভাব। এছাড়াও বড় পুঁজি এবং রিয়েল এস্টেটকে বিপুল কর ছাড় দেওয়া হয়। আসলে রাঘব-বোয়ালদের তুষ্ট রাখার জন্য নিজস্ব কর কম রেখে রাজ্য সরকার মধ্যবিত্ত ও গরীব দুই শ্রেণীর মানুষকে ভাতে মারছে। কর কম আদায় করার দারুণ খরচ বেশি করা যাচ্ছে না। সংগ্রামটা আসলে মধ্যবিত্ত বনাম গরীব মানুষেরনয়, লড়াইটা হলো মধ্যবিত্ত ও গরীব বনাম রাঘব বোয়ালদের। সেই লড়াইয়ের প্রস্তুতি প্রয়োজন।

বাড়ীভাড়া ভাতা

১৯৬৭ সালে প্রথম রাজ্যের সমস্ত জেলার কর্মচারীরা বাড়ীভাড়া ভাতা পাওয়ার অধিকার অর্জন করে। দীর্ঘদিন ধরে সমস্ত অংশের কর্মচারীরা এই হারে বাড়ীভাড়া ভাতা পাওয়ার হার খর্ব করে ১২ শতাংশ হারে নামিয়ে আনা হয়েছে। যেখানে প্রতিনিয়ত দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিজনিত কারণে বাসস্থানের খরচ বাড়ছে, সেখানে এই হার কমিয়ে আনা, এত এক নিদারুণ বঞ্চনা।

চিকিৎসা ভাতা

মুল বেতনের সঙ্গে মহার্ঘভাতা যুক্ত করে নিউট্রিলাইজেশনের প্রশ্নে ম্যাটিক্স ২.৫৭ নির্ধারিত হলে চিকিৎসা ভাতা সহ অন্যান্য ভাতাদি অন্তত ২.৫৭ গুণিতকে বৃদ্ধি পাওয়া উচিত। কিন্তু তা না করে ব্যক্তি ইচ্ছায় যুক্তিহীনভাবে বৃদ্ধি করা হয়েছে।

সরকারী হাসপাতালে চিকিৎসা সংক্রান্ত খরচের ব্যয়ভার ২৫০০ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে মাত্র ৩৫০০ টাকা করা হলো, বর্তমান চিকিৎসা সংক্রান্ত ব্যয়ের সাথে যা আদৌ সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

ইনক্রিমেন্ট

বিগত বেতন কমিশনের সুপারিশক্রমে ৩ শতাংশ হারে বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট কার্যকরী হয়। বর্তমান রোপা রুলে তা বজায় রাখা হলেও, বিভিন্ন লেভেল নির্ধারন ৩ শতাংশের অনেক কম হার নির্ধারন করা হয়েছে। এও এক নতুন ধরনের বঞ্চনা।

অবসরকালীন পেনশন

পঞ্চম বেতন কমিশন কার্যকরী করার সময় ০১/০১/২০০৬-এর আগে অবসর গ্রহণকারী পেনশন ভোগীদের ক্ষেত্রে ৪০ শতাংশ বৃদ্ধি ঘটিয়ে পেনশন নির্ধারণ করায় অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীরা আর্থিক দিক থেকে উপকৃত হয়েছিল। কিন্তু সে ষষ্ঠ বেতন কমিশন ০১/০১/২০১৬-র আগে অবসর গ্রহণকারী পেনশন ভোগীদের ক্ষেত্রে অনুরূপ কোনো সুপারিশ না করায়, তাঁরা আর্থিক দিক থেকে বঞ্চিত হবেন।

গ্র্যাচুইটি

গ্র্যাচুইটির ক্ষেত্রে একইভাবে ২·৫৭ গুণিতকে গ্র্যাচুইটির উর্দ্ধসীমা তিনগুণ বৃদ্ধি না করে যুক্তিহীনভাবে দ্বিগুণ করা হলো।

আশ্চর্যের হলেও সত্যি একমাস অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও রাজ্য সরকার ষষ্ঠ বেতন কমিশনের রিপোর্ট এখনও প্রকাশ্যে আনে নি। রিপোর্টপ্রকাশ্যে না এলে বেতন কমিশনের দৃষ্টিভঙ্গী, নীতিগত অবস্থান স্পষ্ট হত। কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের জন্য গঠিত সপ্তম বেতন কমিশনের রিপোর্টের প্রাসঙ্গিক বিষয়, অন্যান্য রাজ্যের বেতন কাঠামো, রাজ্যের আর্থিক অবস্থার হাল, ন্যূনতম বেতন তৈরীর ভিত্তি ও সুপারিশ, সর্বভারতীয় মূল্যসূচকের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বেতন কাঠামো গঠন, মহার্ঘভাতা, বাড়ীভাড়া ভাতা, চিকিৎসাভাতা সহ অন্যান্য ভাতাদি সম্পর্কে সুপারিশের ভিত্তি, ষষ্ঠ বেতন কমিশন কার্যকরী করতে রাজ্যের আইর্থক দায় এবং তা পূরণে সম্ভাব্য ব্যবস্থা গ্রহণে সুপারিশ ইত্যাদি সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা করা যেত। এ কারণে সংগঠনের পক্ষ থেকে রিপোর্টের কপি চেয়ে অতিরিক্ত মুখ্যসচিব, অর্থ বিভাগের কাছে চিঠি দেওয়া হয়েছে। এছাড়া, এখনও শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী, পঞ্চায়েত, পৌরসভা ও অন্যান্য বিধিবদ্ধ সংস্থাগুলির (রাজ্য সরকার নিয়ন্ত্রিত বোর্ড/কর্পোরেশন)-র জন্য কোনো পরিপূরক রোপা রুলস/পেনশন বিধি প্রকাশিত হয়নি। তাই আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে পঞ্চায়েত, পৌরসভা, শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীসহ অন্যান্য বিধিবদ্ধ সংস্থার শ্রমিক-কর্মচারীদের জন্য পরিপূরক রোপা রুলস/পেনশন বিধি প্রকাশ করার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দাবি জানানো হয়েছে। স্পষ্ট হয়নি বর্তমান ষষ্ঠ বেতন কমিশনের স্ট্যাটাস কি? এর ফলে ক্যাডারগত বিভিন্ন বিষয়, পদোন্নতি সহ অন্যান্য বিষয়গুলির ভবিষ্যৎ স্পষ্ট নয়। রোপা রুলস/পেনশন সংক্রান্ত যে বিধি প্রকাশিত তার ভিত্তিতে উল্লেখযোগ্য অসংগতিগুলির প্রতি ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। ০১/০১/২০১৬-র পূর্বে অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীরাও নিদারুণ বঞ্চনার সম্মুখীন হয়েছেন। এক অর্থে বর্তমান বেতন কমিশন বিদ্যমান বেতন কাঠামোকে ভেঙে দিয়েছে। এর বিরুদ্ধে তাই ব্যাপক জনমত গড়ে তুলতে হবে।

সরকার এবং সরকারের দলদাসরা কোন পক্ষে তা বোঝার জন্য অর্থনীতিবিদ হতে হয় না। নিরন্তর সংগ্রামের ময়দানে অভিজ্ঞ সৈনিক সহজেই শত্রু মিত্রকে চিহ্নিত করতে পারে। এই বঞ্চনার প্রতিবাদে নিরন্তর সংগ্রামই একমাত্র পথ। রাজ্য কোষাগার থেকে বেতনপ্রাপ্ত সমস্ত স্তরের শ্রমিক-কর্মচারী, শিক্ষত-শিক্ষাকর্মীদের নিয়ে আগামী ২৬ নভেম্বর রাস্তায় থাকবে কর্মচারী সমাজ। এতেও বঞ্চনার অবসান না ঘটলে প্রয়োজনে লড়াই নিয়ে যেতে হবে ধর্মঘট পর্যন্ত। সেই লক্ষ্যে প্রস্তুতি নিতে হবে আগামী ৮ জানুয়ারী '২০ ধর্মঘট সফল করার জন্য। ঐ দিন প্রশাসনকে স্তব্ধ করে দিতে, প্রচার শুরু করতে হবে এখন থেকেই। শ্রমিক-কর্মচারীদের একমাত্র ধর্ম ঐক্য এবং লড়াই। ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের জয় হবেই। □

সপ্তম পৃষ্ঠার পর

বিদ্যাসাগরের নাস্তিকতা

Authority র অন্ধ অনুকরণ নয়, - আপনার যুক্তি ও ভাবনার আলোকে প্রতিটি বিষয়ের সত্যাসত্য বিচার করে তার মূল্যায়ন করা- এই মনোভঙ্গীই রেনেসাঁসের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। কোনো কিছুকে না বুঝে, নির্বিবাদে, দ্বিধাহীন চিত্তে গ্রহণ করার বিরুদ্ধে এই প্রবল প্রকৃতিই আধুনিক বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির ভাষায় Scientific Method বা বৈজ্ঞানিক চিন্তা-প্রণালী বলে অভিহিত। এই চিন্তাধারার মূলে রয়েছে সংশয় প্রবৃত্তি অর্থাৎ প্রতিটি বিষয়ের সত্যাসত্য ও যথার্থতা যাচাই করে দেখার মনোভাব। বিদ্যাসাগর-চরিত্রে এই মনোভাবের প্রকাশ ঘটেছিলো পরিপূর্ণভাবে। তাই তিনি প্রকৃতই নবযুগের পথিকৃত রূপে পূজিত হবার যোগ্য।

এই মনোভাবের প্রতিফলন ঘটেছিল তাঁর প্রতিটি চিন্তা-ভাবনার ওপর, ধর্ম্মমতেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। এর ফলেই ধর্ম্মক্ষেত্রে কোনরকম গোঁড়া মনোভাব ধারণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। ধর্ম্মবিষয়ে অযৌক্তিক গোঁড়ামি সম্বন্ধে বর্ত্তমান যুগের একজন শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী (J.B.S. Haldane) তাঁর একটি প্রবন্ধে বলেছেন : খ্রীষ্টধর্মের মধ্যেও নানারূপ দলাদলি ও অযৌক্তিক বিশ্বাস দেখা যায়। খ্রীষ্টের সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্কের বিষয়টিও সব সন্দেহের উর্ধ্বে নয়।

যেখানে একেশ্বরবাদী খ্রীষ্টধর্ম্মের মধ্যে একত্ব (Unitarianism) ও ত্রিত্ব (Trinitarianism) নিয়ে এত মতানৈক্য ও কলহ সেখানে তেত্রিশ কোটি দেব-দেবীতে বিশ্বাসী হিন্দুধর্ম্মের পক্ষে মতৈক্যের কথা তো অকল্পনীয়। বিদ্যাসাগর তাই হিন্দুধর্ম্মের উপাস্য তেত্রিশ কোটি দেব-দেবী সম্বন্ধে সারা জীবন মৌন থেকেছেন, কোনো মন্তব্য করেননি। যে ঈশ্বর বা পরলোকের স্বরূপ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ কোনো ধারণায় উপনীত হওয়া কারো পক্ষেই কদাচ সম্ভবপর নয়, তা' নিয়ে বাদানুবাদ বা হানাহানিতে প্রবৃত্ত হওয়া তাঁর মত যুক্তিবাদী মনের পক্ষে সম্ভব হয়নি। প্রথম জীবনে বিদ্যাসাগর, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রবর্ত্তিত ব্রাহ্মসমাজের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। পরে এর মধ্যে গোঁড়ামি-হেতু মতভেদ ও কলহ সৃষ্টি হওয়ার তিনি সেখান থেকে সরে আসেন। এ-সম্বন্ধে তাঁর জীবনীকার চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন : ''তিন নিজে আমাদের নিকট বলিয়াছেন- 'এ দুনিয়ার একজন মালিক আছেন তা' বেশ বুঝি, তবে ঐ-পথে না চলিয়া এ-পথে চলিলে, নিশ্চয় তাঁহার প্রিয়পাত্র হইব, স্বর্গরাজ্য অধিকার করিব, এ সকল বুঝিও না, আর লোককে তাহা বুঝাইবার চেষ্টাও করি না। লোককে বুঝিয়ে শেষটা কি ফ্যাঁসাদে পড়ে যাব? অন্যকে পথ দেখাইতে গিয়া তাকে বিপথে চালাইয়া শেষটা পরের জন্য বেত খাইয়া মরিব?''

ব্যঙ্গ ও পরিহাস সহকারে উক্ত হলেও এর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে Haldane কথিত ''Rational View''। তিনিও বৈজ্ঞানিক- মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিদের মত যা নিশ্চিতরূপে জানেন না তার সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করা থেকে বিরত থেকেছেন। ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে তাই নীরব থাকতে চেয়েছেন ঈশ্বরচন্দ্র। Herbert Spencer - এর মতে যিনি অজ্ঞাত ও অচিন্ত্যনীয় (the unknown and the unknowable) সেই বিশ্বনিয়ন্তা সম্পর্কে তাই তাঁর ''বোধোদয়'' গ্রন্থে প্রথমে কোনো উল্লেখই করেননি তিনি। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মশাই একবার তাঁকে বলেন, অনেকে নাকি দুঃখ করে বলছেন যে বিদ্যাসাগর মশাই এমন একখানা পাঠ্য পুস্তক রচনা করলেন যাতে ছেলেদের জানবার সব কথাই রয়েছে, কিন্তু ঈশ্বর বিষয়ে কোনো কথা নেই। বিদ্যাসাগর হেসে তাঁকে বললেন : ''যাঁরা তোমার কাছে ওকথা বলেন তাঁদের বোলো যে এবার যে 'বোধোদয়' ছাপা হবে তাতে ঈশ্বরের কথা থাকবে।'' সত্যিই বোধোদয়ের পরবর্ত্তী সংস্করণ থেকে ঈশ্বর সম্বন্ধে একটা পাঠ যোগ করেন তিনি। কিন্তু সে ঈশ্বরের সংজ্ঞা হল 'নিরাকার চৈতন্য স্বরূপ'। বলা বাহুল্য, এই সংজ্ঞা তাঁর যুক্তিসিদ্ধ মনের ধারণার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'সাহিত্য সাধক চরিতমালা' গ্রন্থে বিদ্যাসাগরের মনের এই বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করে বলেছেন : ''এই সংস্কারমুক্ততা, এই সাহস এবং জ্ঞান ও বুদ্ধির উপর এই নির্ভরশীলতা তাঁহার মধ্যে কেমন করিয়া কোথা হইতে আসিল! তাঁহার পারিবারিক ইতিহাসের মধ্যে- রামজয়-ঠাকুরদাস-ভগবতীর মধ্যে, মেদিনীপুর-বীরসিংহের মধ্যে-অথবা সমসাময়িক ঘটনাবলীর মধ্যে- এই সমস্যার সমাধান নাই।''

সত্যিই তাঁর সামাজিক বা পারিবারিক পরিবেশে এ সমস্যার সমাধানের সূত্র খুঁজলে বিফল হতে হবে। এর সমাধান খুঁজতে হবে তাঁর ব্যক্তিগত চরিত্রে- তাঁর দার্ঢ্যে, তাঁর অপরাজেয় পৌরুষে, আর সর্ব্বোপরি তাঁর অনন্য সাধারণ মানবহিতৈষনায়। তাঁর ধর্ম্ম অসহায় আর অক্ষমের অবলম্বন-স্বরূপ নয়, তা তাঁর পৌরুষকে ''করেনি শতধা'', আর ''তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশি'' তাঁর ''বিচারের শ্রোতঃপথ'' গ্রাস করে ফেলতে পারেনি। সে ধর্ম্মের প্রধান ব্রত মানব-প্রীতি ও মানব-সেবা। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন : ''আসলে বিদ্যাসাগর দেবত্ব ও ব্রাহ্মণ্যের সকল গৌরব-বর্জিতভাবে মানুষকে মানুষরূপেই মহৎ ও মহনীয় দেখিতে চাহিয়াছিলেন এবং তাহা চাহিয়াছিলেন বলিয়াই এই গুরু ও শালগ্রামশিলার দেশে তাঁহাকে অপরিসীম ''লাঞ্ছনা'' ভোগ করিতে হইয়াছিল।.... বিদ্যাসাগর-চরিত্রে এই মানব-প্রীতিই সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর কাণ্ড।''

মানুষের দুঃখে তাঁর প্রাণ যেমন করে কেঁদেছে, তেমন করে আর কিছুতেই নয়। চণ্ডীদাসের মত তিনিও বিশ্বাস করেছেন : ''সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।'' যেখানেই সেই মানুষের দুর্দ্দশার কথা শুনেছেন, সেখানেই ছুটে গেছেন তিনি, যথাসাধ্য নয়, সাধ্যের অতিরিক্ত দান করে ঋণজালে জড়িয়ে পড়েছেন, সেবা শুশ্রষা করেছেন প্রাণপাত করে। মানুষের অকৃতজ্ঞতা তাঁকে ব্যথা দিয়েছে কিন্তু বাধা দিতে পারেনি তাঁর সেবাব্রতকে। নরই তাঁর কাছে প্রতিভাত হয়েছে নারায়ণ রূপে। তিনি মেনে নিয়েছেন প্রাচীন গ্রীক্ দার্শনিক পিথাগোরাস (Pythagorus) এর নীতিকে : ''Man is the measure of everything.''

বিদ্যাসাগরের এই ধর্ম্মবোধের সঙ্গে আশ্চর্য্যরকম মিল আছে স্বামী বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের ধর্ম্মবোধের। বিবেকানন্দ সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করেছেন : ''জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।'' রবীন্দ্রনাথও তাঁর ধর্ম্মবোধের স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন তাঁর হিবার্ট বক্তৃতামালা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত কমলা বক্তৃতামালায়, যথাক্রমে The Religion of Man এবং 'মানুষের ধর্ম্ম' নাম দিয়ে। এই ধর্ম্মের মূলকথা মানব-প্রীতি। দিলীপ কুমার রায়কে এক পত্রে রবীন্দ্রনাথ লেখেন: ''আমার সব অনুভূতি ও রচনার ধারা এসে ঠেকেছে মানবের মধ্যে। বার বার ডেকেছি দেবতাকে, বার বার সাড়া দিয়েছেন মানুষ রূপে এবং অরূপে, ভোগে ও ত্যাগে। সেই মানুষ ব্যক্তিত্বে এবং সেই মানুষ অব্যক্ত।''

তাই বিদ্যাসাগর যে-অর্থে নাস্তিক, বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথও সে-অর্থে নাস্তিক বলে গণ্য হবার যোগ্য। এ নাস্তিকতা তথাকথিত আস্তিকতা হতে লক্ষ গুণে শ্রেয়- একথা বলাই বাহুল্য। □

প্রসঙ্গ : বিদ্যাসাগর গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত

দ্বাদশ পৃষ্ঠার পর

শতবর্ষে বর্ষব্যাপী অনুষ্ঠান

সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে আন্দোলনে সমিতি তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা যেমন পালন করেছে তেমনি স্বাধীনতার পরবর্তী সময়েও বিভিন্ন সামাজিক অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে কোথাও প্রত্যক্ষ কোথাও বা পরোক্ষভাবে নিজেদের নিযুক্ত রেখেছে।

কিন্তু ২০১১ সালে আমাদের রাজ্যের সরকারের পরিবর্তন এবং ২০১৪ সালে ভারতবর্ষের সরকার পরিবর্তনের পর নতুন বিপদ এসে হাজির হয়েছে। যারা শ্রম আইন সংশোধন করতে চায়। ট্রেড ইউনিয়ন ধ্বংস করতে চায়। আমাদের অর্জিত অধিকার কেড়ে নিতে চায়। অন্যদিকে ধর্মের নামে, জাতের নামে, বর্ণের নামে শ্রমজীবি ঐক্যকে ভেঙে দেওয়ার জন্য সদা সচেষ্ট হয়ে রয়েছে। তাই এই কঠিন সময়ে আমাদের মতন শতবর্ষ প্রাচীন সমিতিকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। রাজ্য ও কেন্দ্র যে নীতি নিয়ে চলছে তার বিরুদ্ধে আরো সোচ্চার হতে হবে, নিজেদের শক্তিকে করতে হবে সংহত। নতুন নতুন কর্মসূচী করতে হবে। প্রতিনিয়ত থাকতে হবে রাস্তায়। আর সেই রাস্তাই হবে শতবর্ষ প্রাচীন সমিতিকে তিল তিল করে গড়ে তোলা পূর্বসুরীদের উপর প্রকৃত শ্রদ্ধা।

সমিতির শতবর্ষকে স্মরণীয় করে রাখতে এবং এই গৌরবজ্জ্বল অধ্যায়ের গৌরবগাথা কে কর্মচারী ও পরিবারের মধ্যে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে সমিতির শতবর্ষে সারা বছরব্যাপী আলোচনা সভা, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, স্বেচ্ছায় রক্তদান সহ মরণোত্তর দেহদান ও চক্ষুদান শিবির প্রমুখ কর্মসূচী গৃহিত হয়। এই উপলক্ষ্যে একটি শক্তিশালী শতবর্ষ উদযাপন কমিটি তৈরী হয়। এই সঙ্গে সঙ্গে কাজের সুবিধার্থে ১২টি উপসমিতি তৈরী হয়।

সাংস্কৃতিক কর্মসূচী হিসাবে প্রত্যেক জেলাই আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাস জুড়ে সঙ্গীত, বক্তৃতা, বিতর্ক, প্রবন্ধ, ক্যুইজ প্রতিযোগীতার আয়োজন করে। তাদের প্রথম স্থানাধীকারীরা গত ২১শে সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয়ভাবে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগীতা যা কলকাতায় সম্পন্ন হয় তাতে অংশগ্রহণ করে।

শতবর্ষ উদযাপন কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে শঙ্কর বিশ্বাস, অজয় মল্লিক ও দেবদুত্ত গুপ্ত স্মারক বক্তৃতা ইতিমধ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছে। রাজেন ভট্টাচার্য স্মারক বক্তৃতা আগামী সময়ে অনুষ্ঠিত হবে। অজয় মল্লিক স্মারণক বক্তৃতা মৌলালী যুবকেন্দ্রে গত ২১ সেপ্টেম্বর '১৯ অনুষ্ঠিত হয়। বিষয় ছিল বর্তমান সন্ধিক্ষণ ও বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকা। আলোচক ছিলেন ডাঃ মানস গুমটা সম্পাদক অ্যাসোসিয়েশন অফ হেলথ সার্ভিস ডক্টরস এবং জয়দেব দাসগুপ্ত সাধারণ সম্পাদক ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ফেডারেশন, সঞ্চালক দায়িত্বে ছিলেন অশোক পাত্র প্রাক্তন সভাপতি রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি। শঙ্কর বিশ্বাস স্মারক বক্তৃতা গত ২৯ জুন '১৯ কৃষ্ণপদ ঘোষ মেমেরিয়ালে অনুষ্ঠিত হয়। বিষয় ছিল ভারতের গণতন্ত্র মূল্যবোধ ও অসহিষ্ণুতার রাজনীতি। বিষয়টির আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক শ্যামল চক্রবর্তী।

কমরেড দেবু দত্তগুপ্ত স্মারক বক্তৃতা গত ১৮ আগস্ট ও কর্মচারী সমাজ এই শীর্ষক আলোচনায় আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিল অধ্যাপিকা নন্দিনি মুখার্জী। আগামী নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০১৯ মিলন মেলা অনুষ্ঠিত হবে এবং পরিবারের অনুজ ১০ বছর সন্তান সন্তনির জন্য বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, বিভন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগীতা ও গানের লড়াই অনুষ্ঠিত হবে। □

দশম পৃষ্ঠার পর

দানবীয় আইন সংস্কার

মিনিমাম ওয়েজের নতুন সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। এতদিন ন্যূনতম মজুরী নির্ধারণের জন্য যে অ্যাক্রেডিয় ফর্মুলা ছিল তা পরিবর্তন করে পরিশ্রমের সময়, উৎপাদনের পরিমাণ, শ্রমিকের দক্ষতা এবং ভৌগলিক অবস্থান প্রভৃতি দেখে ন্যূনতম মজুরী তৈরি হবে। এটা নিশ্চিত করে বলা যায় যে আগামীদিনে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারন আরও জটিল হয়ে পড়বে। এই আইনে বোনাসের ন্যূনতম পরিমাণ বলা হয়েছে---(i) বেতনের 8.33% অথবা (ii) 100 টাকা---এর মধ্যে যেটি বেশি বেতনের 8.33% বলতে এক মাসের বেতন বোঝায়, অর্থাৎ এক মাসের বেতন ১০০ টাকারও কম হতে পারে কোন কোন ক্ষেত্রে, এমন সম্ভাবনাও রয়েছে। আগামীদিনে অন্যান্য কোডগুলিকে আইনে পরিণত করে ধর্মঘটকে নিষিদ্ধ করা এবং মালিকদের পক্ষে শ্রম-আইনগুলিকে আরো শিথিল করার প্রচেষ্টা থাকবে।

এবারের বাজেট অধিবেশনে সবথেকে আলোড়ণ সৃষ্টিকারী ঘটনা হলো ৩৭০ ও ৩৫এ ধারা বাতিল করা এবং জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যকে ভেঙ্গে দুটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পরিণত করা। সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিকভাবে এটা করা হয়েছে। রাষ্ট্রপতি একটি নোটিফিকেশন জারী করে ৩৭০ ধারা বাতিল করেছেন। সংবিধানের ৩৭০(৫) ধারাতে বলা আছে যে যদি জম্মু ও কাশ্মীরের গণপরিষদ সম্মতি জানায় তাহলে ভারতের রাষ্ট্রপতি ৩৭০ ধারা বাতিল করতে পারে। বর্তমান জম্মু ও কাশ্মীরে গণপরিষদ নেই। সেক্ষেত্রে রাজ্য বিধানসভা গণপরিষদের ভূমিকা পালন করবে। আবার যেহেতু রাজ্য বিধানসভাও ভেঙ্গে দিয়ে কাশ্মীরে রাষ্ট্রপতির শাসন জারী রয়েছে, তাই রাজ্যপালের অনুমোদনে রাষ্ট্রপতি ৩৭০ ধারা বাতিল করলেন। কিন্তু রাজ্যপাল সর্বদাই কেন্দ্রের প্রতিনিধি, রাজ্যের মানুষের নয়। ফলে রাজ্যের মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোন মূল্যায়ণ ছাড়াই এতবড় একটা পদক্ষেপ নেওয়া হলো। সুপ্রিম কোর্টে এই পদক্ষেপ অসাংবিধানিক বলে ইতিমধ্যেই মামলা দায়ের হয়েছে। একই সঙ্গে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যকে পুনর্গঠনের নামে দুটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ভেঙ্গে দেওয়া হল—একটি লাদাখ, যার কোন বিধানসভা থাকবে না এবং অপরটি জম্মু ও কাশ্মীর, যার একটি বিধানসভা থাকবে। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল রাজ্যে উন্নীত হত, কিন্তু বিজেপির আমলে রাজ্য কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে অবনমিত হচ্ছে। আসলে সারা দেশ পেছনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বিজেপি সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে শ্রমিক-কৃষক কর্মচারী স্বার্থবিরোধী আইন প্রণয়ন করে চলেছে। এর বিরুদ্ধে রাস্তায় ব্যারিকেড গড়ে তুলতে হবে। □

সপ্তদশ লোকসভার অধিবেশন — দানবীয় আইন সংস্কার

প্রণব কর

সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচন পরবর্তীকালে মোদী সরকারের প্রথম বাজেট অধিবেশন গত ১৭ জুন থেকে ৭ আগস্ট পর্যন্ত চলেছে। গত ২০ বছরে এত দীর্ঘ কোন অধিবেশন হয়নি। এই অধিবেশন চলে ৫২ দিন ধরে, মোট ৩৯টি বিল পেশ করা হয়েছে এই অধিবেশনে— যা একটি রেকর্ড। আবার এই ৩৯টি বিলের মধ্যে একটি বিলও কোন স্ট্যান্ডিং কমিটি, সিলেক্ট কমিটি বা জয়েন্ট কমিটির কাছে পাঠানো হয়নি এই অধিবেশনে — এটিও একটি রেকর্ড। এই যে ৩৬টি বিলকে আইনে পরিণত করা হলো এর মধ্যে এমন একটিও বিল পাওয়া যাবে না যা শ্রমিক-কৃষক-কর্মচারী সমাজের স্বার্থে পেশ করা হয়েছে। যেসব বিলগুলি পেশ করা হয়েছে তার মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিল হলো—

(১) দ্য জম্মু এ্যাণ্ড কাশ্মীর রি-অর্গানাইজেশন বিল, ২০১৯— এই বিলটি ৫.৮.২০১৯ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ রাজ্যসভায় পেশ করেন যার মাধ্যমে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যকে জম্মু ও কাশ্মীর কেন্দ্রীশাসিত অঞ্চল ও লাদাখ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল—এই দুটি অংশে ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে।

এই বিল পেশ করার সঙ্গে সঙ্গে অমিত শাহ রাষ্ট্রপতির একটি নির্দেশিকা জারি করে 'অ্যাপ্লিকেশন টু জম্মু এ্যাণ্ড কাশ্মীর অর্ডার, ১৯৫৪'— যার মাধ্যমে ৩৭০ ধারা জারী করা হয়েছিল অ বাতিল করে 'দ্য কনস্টিটিউশন (অ্যাপ্লিকেশন টু জম্মু এ্যাণ্ড কাশ্মীর) অর্ডার, ২০১৯' আদেশনামাটি চালু করা হয়।

(২) দি কোড অন ওয়েজেস, ২০১৯— শ্রমিমন্ত্রী সন্তোষ গাঙ্গোয়ার ২৩.৭.২০১৯ তারিখে লোকসভায় পেশ করেন। বিলটি উভয়কক্ষে পাশ হয়ে ৮.৮.১৯ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি নিয়ে আইনে পরিণত হয়।

(৩) দি রাইট টু ইনফর্মেশন (অ্যামেণ্ডমেন্ট) বিল, ২০১৯— প্রতিমন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং ১৯.৭.২০১৯ তারিখে এই বিলটি লেকসভায় পেশ করেন রাইট টু ইনফরমেশন অ্যাক্ট, ২০০৫—আইনটিকে সংশোধনের উদ্দেশ্যে।

(৪) দি ন্যাশনাল ইনডেস্টিগেশন এজেন্সি (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল, ২০১৯।

(৫) দি আনলফুল অ্যাক্টিভিটিস (প্রিভেনশন) অ্যামেন্ডমেন্ট বিল, ২০১৯— দুটি বিলই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৮.৭.২০১৯ লোকসভায় পেশ করেন।

(৬) দি মুসলিম ওম্যান (প্রোটেকশন অব রাইটস অন ম্যারেজ) বিল, ২০১৯—বিলটি আইন ও বিচারমন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদ ২১.৬.২০১৯ তারিখে লোকসভায় পেশ করেন।

তালাক-এ-বিদ্দাত বা তিন তালাককে নিষিদ্ধ করা হয়েছে 'দি মুসলিম ওম্যান (প্রোটেকশন অব রাইটস অন ম্যারেজ) বিল, ২০১৯ পাশ করানোর মধ্য দিয়ে। এই বিলে তিন তালাক দেওয়াকে 'Congnizable offence' বলে ঘোষণা করা হয়েছে। 'Cognizable offence' বলতে সেই জাতীয় অপরাধকে বোঝায় যে অপরাধের জন্য একজন পুলিশ অফিসার কোন ওয়ারেন্ট ছাড়াই একজনকে গ্রেপ্তার করতে পারে। এর ফলে যিনি তিন-তালাক দেবেন তার তিনবছর পর্যন্ত জেল হতে পারে যদি বিবাহিত মুসলিম মহিলা বা তার সঙ্গে রক্তের সম্পর্কের কেউ অভিযোগ জানায়। প্রশ্ন উঠেছে এখনেই— যদি অভিযুক্ত স্বামী জেলেই চলে যায় তবে সেই বিয়ে কি আর সত্যিই টিকে থাকার অবস্থায় থাকবে? নাকি মুসলিমদের অপরাধী প্রমাণ করার তাগিদ থেকেই বিলটিকে ফৌজদারী বিধি যুক্ত করা হলো দেওয়ানী বিধির বদলে।

'বেআইনী কার্যকলাপ প্রতিরোধ আইন (ইউএপিএ) সংশোধনী বিল লোকসভায় পাশ করিয়ে গণতন্ত্রকে দিয়ে গণতন্ত্র উপরানোর ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করা হল। সংশোধনীতে বলা হয়েছে সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের সঙ্গে জড়িত না থাকলেও আগামী দিনে সন্ত্রাসবাদী সন্দেহেই যে কাউকে গ্রেপ্তার করা যাবে। এ ছাড়াও 'এন আই এ (সংশোধনী) বিল ২০১৯' একটি সংশোধনী সংযুক্ত করে বলা হয়েছে যে আগামী সময়ে যে কোনো রাজ্যের বাসিন্দার বাড়িতে তল্লাসী চালাতেও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার অধিকার থাকবে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (আইএনএ)-এর হাতে। এ জন্য সংশ্লিষ্ট রাজ্যের পুলিশের অনুমতিও লাগবে না এন আই এ-এর। কি বলবেন— জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের শতবর্ষে রাউলাট আইনের প্রত্যাবর্তন? আশ্চর্যজনক ঘটনা হলো দুটি সংশোধীনতেই কংগ্রেস সমর্থন দিয়েছে।

'আর টি আই অ্যামেন্ডমেন্ট বিল, ২০১৯' ও ভয়ানক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে বিরোধী রাজনৈতিক দল ও সিভিল রাইটস অ্যাক্টিভিস্টদের মধ্যে। কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশন গঠিত হয়েছে একজন মুখ্য তথ্য কমিশনার (সি আই সি) এবং ১০ জন তথ্য কমিশনারকে নিয়ে। রাষ্ট্রপতি তাদের নিয়োগ করেন পাঁচ বছরের জন্য এবং তাদের বেতন হয় মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এবং নির্বাচন কমিশনারদের সমান। মেয়াদ এবং মাইনে এইভাবে করা হয়েছিল যাতে করে কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশন সরকারী হস্তক্ষেপ ব্যতীত স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে।

কিন্তু 'আর.টি.আই. অ্যামেন্ডমেন্ট বিল, ২০১৯'-এ মোদি সরকার মুখ্য তথ্য কমিশনারদের পাঁচ বছরের নির্দিষ্ট মেয়াদ এবং নির্দিষ্ট বেতন ব্যবস্থাটিকে বাতিল করে দিলেন। এখন থেকে মুখ্য তথ্য কমিশনার এবং তথ্য কমিশনারদের মেয়াদ এবং বেতন রাজনৈতিক নেতৃত্বের উপর নির্ভর করবে। মানে তথ্য কমিশনের স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষমতা তীব্রভাবে সংকুচিত হবে, তাদের কাজে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বিপুলভাবে বাড়বে, যে কোনে সময়ে তাদের বহিষ্কার করার ক্ষমতা এবং বেতন হ্রাস/বৃদ্ধির করার ক্ষমতা থাকছে রাজনৈতিক নেতৃত্বের হাতে।

কিন্তু কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশনের উপর কেন হঠাৎ এমন খাপ্পা হয়ে উঠল কেন্দ্রীয় সরকার? তার পেছনে সাম্প্রতিক অতীতে কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশনের কিছু আদেশামার ভূমিকা রয়েছে যার মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষাগত যোগ্যতা বিষয়ক তথ্য ও রাষ্টায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির অপরিশোধিত ঋণের পরিমাণ জড়িয়ে আছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ঘোষণা করেন যে তিনি 'Entire Political Science'-এ 1978, সাল স্নাতক ডিগ্রি পেয়েছেন দিল্লী ইউনির্ভাসিটি থেকে। প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্যকে কেন্দ্র করে ২০১৭ সালের জানুয়ারী মাসে একজন আর.টি.আই কর্মীর আবেদন অনুসারে তথ্য কমিশনার শ্রীধর আচারয়ুলু দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়কে নির্দেশ দেন ১৯৭৮ সালে যারা ঐ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হয়েছেন তাদের নাম প্রকাশ করতে। ঐ তালিকায় দিল্লীতে নরেন্দ্র মোদির নাম পাওয়া যায়নি। তথ্য কমিশনের অপর একটি আদেশনামায় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়াকে নির্দেশ দেওয়া হয় যে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির নন-পারফর্মিং অ্যাসেট-এর ব্যাপারে বিশদে জানাতে এবং ঋণখেলাপিদের তালিকা প্রকাশ করতে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক গোপনীয়তা রক্ষার জন্য এই তথ্য দিতে অস্বীকার করলে সুপ্রিম কোর্ট ২০১৫ সালে এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে এবং তথ্য প্রকাশ করতে বলে। ২০১৯-এর এপ্রিল মাসে সুপ্রিম কোর্ট পুনরায় রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে নির্দেশ দিয়েছে এইসব তথ্য প্রকাশের জন্য। ফলে তথ্য কমিশনের ডানা তো ছাঁটতেই হবে।

দি কোড অন ওয়েজেস, ২০১৯ গত ৮.৮.২০১৯ তারিখ থেকে লাগু হয়ে গেছে। এই কোডে চারটি শ্রম সংক্রান্ত আইনকে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। এগুলি হল— (i) দি পেমেন্ট অব ওয়েজস অ্যাক্ট, ১৯৩৬, (ii) দি মিনিমান ওয়েজস অ্যাক্স, ১৯৪৮, (iii) দি পেমেন্ট অব বোনাস অ্যাক্ট 1965 এবং (iv) দি ইকুয়াল রেমুনারেশন অ্যাক্ট, 1976 শ্রমমন্ত্রক ইতিমধ্যেই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে বর্তমান প্রচলিত 44 টি শ্রম আইনকে 4টি কোডের মতো নিয়ে আসা হবে। এটি প্রথম কোড। এই কোডে

▶▶ নবম পৃষ্ঠার পঞ্চম কলমে

▶▶ একাদশ পৃষ্ঠার পর

বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে বিদ্যাসাগর

উদযোগের মধ্যে আছেন জিজ্ঞাসা করতে আমরা যখন অপরাপর ব্যক্তিদিগের মধ্যে ... দলের নাম করিলাম, তখন বিদ্যাসাগর বলিয়া উঠিলেন, 'যা, তবে তোমাদের সকল চেষ্টা পণ্ড হয়ে যাবে। ওদের এর ভিতরে নিলে কেন?'

'আনন্দমোহনবাবু ও আমি বলাবলি করিতে করিতে ফিরিলাম যে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রকৃতি জানাই আছে, তাঁহার কাছে স্বর্গ ও নরক ভিন্ন মাঝামাঝি একটা স্থান নাই। যাকে ভাল জানিবেন তাঁকে স্বর্গে দিবেন, যাকে মন্দ জানিবেন তাকে একেবারে নরকে দিবেন। ... প্রতি বোধ হয় কোন কারণে বিরক্ত হইয়াছেন, আর ওদের নামও সহিতে পারেন না।"

প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন যে, বিদ্যাসাগরের কাছে শিবনাথ শাস্ত্রী বিশেষ প্রীতির পাত্র ছিলেন। তিনি ও আনন্দমোহন বলা সত্ত্বেও এবং ভারতসভার ন্যায় একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেও কেন তিনি এর সভাপতি পদে আসীন হতে রাজি হলেন না? এর দুটি কারণ রয়েছে। প্রথম কারণটি হল তিনি মনে করতেন একটি দল তৈরি করে কাজকর্ম করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। অর্থাৎ প্রধান বাধা তাঁর চরিত্রের পূর্বোক্ত প্রবণতা। আর দ্বিতীয় কারণটি হল ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ। কেবল রাজনৈতিক সভা নয় সমসাময়িক বিদ্বৎ-সভাগুলির দু-একটা বাদে বিদ্যাসাগর খুব যে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন তা নয়।

দ্বিতীয়ত, বিদ্যাসাগর যার জন্য বিখ্যাত হয়ে আছেন, সেই সংস্কার চিন্তার মধ্যেও যে নিরবচ্ছিন্ন সংগতি ছিল তা বলা যাবে না। এই প্রসঙ্গে তাঁর বিধবা বিবাহ আন্দোলনের প্রসঙ্গ এসে যায়। বিদ্যাসাগর হিন্দু সমাজে বিধবা বিবাহ প্রবর্তনের জন্য আইনসঙ্গতভাবে উদ্যোগী হয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু শুধুমাত্র একটি রাষ্ট্রীয় আইনের সামাজিক সার্থকতা কতটা সম্ভব, তা তিনি তলিয়ে দেখেননি। এর পাশাপাশি সামাজিক প্রাতিষ্ঠানিক রূপে হিন্দু বিবাহের যে সমস্ত গলদ ছিল, যেগুলি সংশোধন বা বাতিল না করলে বিধবা বিবাহ আইন কার্যকর করা অসম্ভব ছিল, সে সম্পর্কে বিদ্যাসাগর বিশেষ ও গভীর ভাবে চিন্তা করেননি। উদাহরণস্বরূপ বলা চলে হিন্দু সমাজে বহু বিবাহ এবং বাল্য বিবাহ নিষিদ্ধ নয়। এগুলি যদি চালু থাকে তাহলে বিধবা বিবাহ আইন সঙ্গত হলেও তার কার্যকারিতা ব্যাহত হতে বাধ্য। স্বামী-স্ত্রী ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও দাম্পত্য বন্ধনের মদ্যে যদি পারস্পরিক দায়িত্ববোধের কোনো বাধ্যবাধকতা না থাকে বা যদি তা শুধুমাত্র বিবাহিত স্ত্রীর ক্ষেত্রেই থাকে, তাই সেখানে বিধবা বিবাহ আইনী হলেও বা তার পরিণাম কি? পুরুষের দিক থেকে বিধবা বিবাাহ যদি দায়িত্বজ্ঞানহীন বহু বিবাহের অঙ্গ হয়, তাহলে প্রকৃত অর্থে বিধবাদের যন্ত্রণা কি লাঘব হয়! এই বিষয়টি কার্যক্ষেত্রে বিধবা বিবাহ সম্পর্কে অর্জিত অভিজ্ঞতা থেকে বিদ্যাসাগর উপলব্ধি করেছিলেন। কিন্তু উপলব্ধি করলেও বিদ্যাসাগর হিন্দু বিবাহের মূল সংস্কারটি সংশোধন করতে চাননি। একথা আরো বেশি করে মনে হয় যে, বিদ্যাসাগরের সমসাময়িক ইয়ং বেঙ্গলের দল এ বিষযে চিন্তা-ভাবনা করে হিন্দু বিবাহের প্রথানুগত্যকে রাষ্ট্রীয় আইনের বন্ধনে আবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। বিশেষত তারা বিবাহ রেজিস্ট্রেশনের আইন পাশ করিয়ে এক বিবাহ ও স্বামী-স্ত্রীর ব্যক্তিগত বন্ধন দৃঢ় করার পক্ষে ছিল। শুধু ইয়ং বেঙ্গল দলই নয়, 'সুহৃদ সমিতির' সভ্যরাও এই বিবাহ রেজিস্ট্রেশনের দাবি করেন। বিধবা বিবাহ আইনটিকেও তাঁরা এইভাবে সংশোধন করতে চেয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর বিবাহ রেজিস্ট্রেশনের পক্ষে মতপ্রকাশ করেননি।

তৃতীয়ত, বিদ্যাসাগরের শিক্ষা চিন্তার মধ্যেও কিছু কিছু স্ববিরোধিতার লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়। মিস কার্পেন্টার যখন ফ্রী নর্মাল বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব করেন, বিদ্যাসাগর কিন্তু এই প্রস্তাব সমর্থন করেননি। তিনি তৎকালীন ছোটলাট উইলিয়াম গ্রে'কে লিখিত এক পত্রে বলেন যে এদেশে কার্পেন্টারের প্রস্তাব অনুযায়ী শিক্ষিকা গড়ে তোলা সম্ভব নয়। কারণ তিনি মনে করেন যে, সমাজের বর্তমান অবস্থা ও দেশবাসীর মনোভাব এরকম কোনো শিক্ষিকা-শিক্ষণ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরিপন্থী। এইরকম ধরনের যুক্তি কি করে বিদ্যাসাগরের পক্ষে দেওয়া সম্ভব — তা ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। কারণ স্ত্রী শিক্ষার প্রসার, বিধবা বিবাহের পক্ষে এবং বহু বিবাহের বিপক্ষে বিদ্যাসাগর যখন আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন, তখনকার সমাজ ও মানুষের মনোভাব কি এসবের পক্ষে ছিল। এতদসত্ত্বেও তিনি যে যুক্তির জোরে সেই সময় স্ত্রী শিক্ষার পক্ষে এবং বিধবা বিবাহের পক্ষে এবং বহু বিবাহের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিলেন, সেই যুক্তিগুলি ফ্রী নর্মাল বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে ভুলে গেলেন কি করে? পত্রে তিনি লিখেছিলেন যে, যতই তিনি এ সম্বন্ধে ভাবছেন, ততই তাঁর ধারণা দৃঢ়তর হচ্ছে। কিন্তু এই ধারণাটি কি? তা কি এই যে, সমাজের বাস্তব অবস্থা এবং দেশবাসীর মনোভাব যদি অনুকূল না তাকে, সমাজ কল্যাণের জন্য কোন কাজ করা যাবে না।

গ্রে সাহেবের নিকট লেখা এই পত্রটির সময়কাল ছিল ১৮৬৭ সালের ১লা সেপ্টেম্বর অর্থাৎ বিধবা বিবাহ আইন প্রণীত হওয়ার দশ বছর পর। এটি কি সত্য যে সমাজ সংস্কারের দশ বছরের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় কি তিনি কিছুটা হতাশ হয়ে সমাজের রক্ষণশীল মনোভাবের নিকট কিছুটা হলেও নতিস্বীকার করলেন? সময়ের দাবি যদি কোনো সংস্কার কর্মের মানদণ্ড হয়, যদি কোনো সামাজিক কল্যাণকর্ম তার মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে, তাহলে বিধবা বিবাহ প্রবর্তন এবং বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর ফ্রী নর্মাল বিদ্যালয়ের স্থাপনের প্রস্তাবের বিরোধিতা করা সংগত নয়। সেই সময 'সোমপ্রকাশ', 'তত্ত্ববোধিনী' প্রভৃতি পত্রিকায় এই কালোপযুগীয় যুক্তি খণ্ডন করে তিনি প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তাঁরাও আশ্চর্য হয়ে গেছিলেন।

অথচ এই বিদ্যাসাগরই তাঁর পুত্র নারায়ণের বিবাহ সম্পর্কে তাঁর সহোদর ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্রকে লেখা একপত্রে বলেছিলেন যে, তিনি দেশাচারের দাস নন, সমাজের চোখ রাঙানিকে তিনি ভয় পান না এবং সমাজের মঙ্গলের জন্য যা প্রয়োজন তিনি তা করতে পশ্চাদ'পসরণ করবেন না। এই ধরনের মানুষ কি করে 'সহবাস সম্মতি আইন' ও ফ্রী নর্মাল বিদ্যালয়ের ব্যাপারে সমাজের রক্ষণশীলতার নিকট আত্মসমর্পণ করলেন, তা আশ্চর্যের বিষয়। এর মধ্যে তাঁর চিন্তাধারার মধ্যবিত্ত সুলভ অসংগতি ও স্ব-বিরোধই প্রকাশ পেয়েছিল।

।। তিন ।।

বিদ্যাসাগরের চরিত্র ও কর্মধারার মধ্যে যে শ্রেণীবদ্ধতা ও ব্যর্থতার বিষয় আলোচনা করা হলো তার কোনটির দ্বারাই বিদ্যাসাগরের মহত্ত্ব ম্লান হয় না। এইসব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বিদ্যাসাগরের জীবন ও চরিত্র আমাদের নিকট সত্যই বিস্ময়কর। যে যুগে বিদ্যাসাগর জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সেই যুগের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে তাঁর মতন ব্যক্তিত্বের আত্মপ্রকাশ কিভাবে হলো? ব্যক্তি চরিত্রের সামাজিকীকরণ সে যুগে সম্ভব ছিল না। সমাজ তখন অনেকটা 'বনজঙ্গলের' মতন ছিল। তাঁর মধ্যেই বিদ্যাসাগরের ন্যায় মানুষেরা মাথা তুলে দাঁড়াতেন। তখন ধনতন্ত্রের ঊষাকাল, সুস্থ স্বাধীন প্রতিযোগিতার স্বর্ণযুগ, প্রতিভার বিকাশের অনেক সুযোগ। যদিও আমাদের দেশে তার সীমাবদ্ধতা অনস্বীকার্য। মানুষের সঙ্গে মানুষের পার্থক্য অনেক। মানুষ তখন সবেমাত্র আত্মসচেতন হচ্ছে এবং সেই নতুন আত্মসচেতনতার ভিতর দিয়ে তার পুরানো সমাজ চেতনার রূপান্তর ঘটছে। বাংলাদেশে এই যুগ সন্ধিক্ষণেই বিদ্যাসাগররের ন্যায় মানুষদের আবির্ভাব। বিদ্যাসাগর সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন বিদ্যাসাগর বাংলাদেশে 'একক' ছিলেন এবং "বৃহৎ বনস্পতি যেমন ক্ষুদ্র বনজঙ্গলের পরিবেষ্টন হইতে ক্রমেই শূন্যে আকাশে মস্তক তুলিয়া ওঠে, বিদ্যাসাগর সেইরূপ বয়োবৃদ্ধি সহকারে বঙ্গ সমাজের সমস্ত অস্বাস্থ্যকর ক্ষুদ্রতাজাল হইতে ক্রমশই শব্দহীন সুদূর নির্জনে উত্থান করিয়াছিলেন"।

বিদ্যাসাগর চরিত্রের অত্যাশ্চর্য সংগতি পরিলক্ষিত হয় তার মূল জীবন দর্শনের মধ্যে। প্রচলিত ধর্ম ও আধ্যাত্মবাদী ভারতীয় দর্শনের প্রতি বিরূপ মনোভাবের কোনো পরিবর্তন জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তার হয়নি। তিনি হয়তো ঈশ্বর বিশ্বাসী ছিলেন তবে তিনি যে একেশ্বরবাদী ছিলেন এবং তাঁর ধর্ম বিশ্বাস বা ঈশ্বর বিশ্বাস যে একান্ত ব্যক্তিগত বিষয় ছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তাঁর দৈনন্দিন জীবনের আচার-আচরণের মধ্যেও তিনি কখনো কোনো অসংগতির পরিচয় দেননি। এইদিক থেকে মানুষ হিসাবে তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় আমরা পাই যা বর্তমান যুগেও কোনো কোনো শিক্ষিত মানুষের মধ্যে এমনকি বিজ্ঞানীদের মধ্যে পাওয়া যায় না।

দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রত্যয়ের দিক থেকে বিদ্যাসাগর অনেকটাই বস্তুবাদী ছিলেন। ভারতের প্রসিদ্ধ বেদান্ত ও সাংখ্য দর্শন সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর এক পত্রে লেখেন, "For certain reasons, which it is needless to state here, we are obliged to continue the teaching of the Vedanta and Sankhya in the Sanskrit College. That the Vedanta and Sankhya are the false systems of philosophy is no more a matter of dispute." বেদান্ত ও সাংখ্য দর্শন যে ভ্রান্ত, তা নিযে কোনো সংশয় নেই। এরকম মন্তব্য করার ন্যায় সৎ সাহস বিদ্যাসাগরের যুগে তো দূরের কথা, তাঁর জন্মের প্রায় দু'শ বছর পরে ক'জন সুশিক্ষিত বিদ্বান বলতে পারবেন? বস্তুবাদী জীবন দর্শনে শ্রদ্ধাশীল ও আস্থাশীল না হলে এই ধরনের অবস্থান গ্রহণ সম্ভব নয়। বিদ্যাসাগর ছিলেন আমাদের দেশের কয়েকজন আধুনিক মানুষের অন্যতম এবং শ্রেষ্ঠ। আধুনিক অগ্রগামী মানুষের চিন্তাধারায় তিনি জীবিত থাকবেন। □

সৌজন্যেঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার 'জলপড়ে পাতা নড়ে' পত্রিকা

বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে বিদ্যাসাগর

প্রণব চট্টোপাধ্যায়

বিদ্যাসাগর সম্পর্কে কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত লিখেছিলেন, ''তিনি প্রথম আধুনিক মানুষ''। নিঃসন্দেহে তিনি ছিলেন একজন আদর্শ পুরুষ। তাঁর সততা, নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতার দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে তাঁর ব্যক্তিগত চরিত্র একদিকে যেমন দুর্ভেদ্য, তেমনি সামাজিক কর্মজীবনের লক্ষ্যের প্রতি একাগ্রতার প্রশ্নে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। কিন্তু একজন সামাজিক শ্রেণীবদ্ধ মানুষ হিসেবে এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একস্তর থেকে অন্যস্তরে তাঁর স্তরান্তর, তাই সীমাবদ্ধতাও ছিল। সমকালীন সমাজের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শ্রেণীগত দ্বন্দ্ব, চিন্তার সীমাবদ্ধতা বা অসংগতি, তাঁর কর্মজীবনের বিভিন্ন ধারাকে প্রতিফলিত করেছে। এ প্রসঙ্গে ঋণভারে বিপন্ন হয়ে ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (ইনি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা) ঋণ পরিশোধ বিষয়ে তাঁকে লেখা পত্রে তাঁর খেদোক্তি, ''আমাদের দেশের লোক এত অসার ও অপদার্থ বলিয়া পূর্বে জানিলে, আমি কখনই বিধবা বিবাহ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতাম না। তৎকালে সকলে যেরূপ উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন তাহাতেই আমি সাহস করিয়া এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। নতুবা বিবাহ ও আইন প্রচার পর্যন্ত করিয়া ক্ষান্ত থাকিতাম। দেশহিতৈষী সৎকর্মোৎসাহী মহাশয়দিগের বাক্যে বিশ্বাস করিয়া ধনে প্রাণে মারা পড়িলাম''।

বলাই বাহুল্য 'সার ও পদার্থ' বলতে বিদ্যাসাগর এ দেশের মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণীর কথা উল্লেখ করেছেন, যাদের মধ্যেই বিদ্যাসাগরের সমাজ সংস্কার, শিক্ষা সংস্কার প্রভৃতি সীমাবদ্ধ ছিল। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উৎসাহ ও সহযোগিতার উপর তাঁর কাজকর্মের সাফল্য ব্যর্থতা নির্ভর করতো। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন যে একজন মানুষের সামাজিক কর্মকাণ্ডের মূল্যায়ন সবসময়েই সমকালীন সামাজিক পরিস্থিতি, তার দ্বিধা দ্বন্দ্বের প্রেক্ষাপটেই বিচার করতে হবে। বিদ্যাসাগরের ক্ষেত্রেও তা একইভাবে সত্য। এই কারণে বিধবা-বিবাহ, স্ত্রী-শিক্ষা, বাল্য বিবাহ, বহু-বিবাহ সম্পর্কে তাঁর অবস্থানকে সমকালীন সামাজিক দ্বন্দ্বগুলির আলোকেই বিচার করতে হবে।

।। এক ।।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮২০ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর (১২২৭ সালের ১২ আশ্বিন) তৎকালীন হুগলী জেলার (বর্তমান মেদিনীপুর) বীরসিংহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। গ্রামেরই পাঠশালায় ঈশ্বরচন্দ্র ভর্তি হন। আট বছর বয়স পর্যন্ত তিনি পাঠশালায় পড়াশোনা করেন। এরপর পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে ১৮২৮ সালে তিনি বীরসিংহ গ্রাম থেকে পায়ে হেঁটে কলকাতায় আসেন। পথে মাইলফলক দেখে তিনি ইংরেজী অক্ষর গুণতে শেখেন। তিনি কলকাতায় এসেছিলেন সংস্কৃত ভাষা শিখতে। কলকাতায় তখন ইংরেজী শিক্ষার পরিবেশ। তৎকালীন সময়ে হিন্দু কলেজের খ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। কেউ কেউ ঈশ্বরচন্দ্রকে ইংরেজী পড়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র বলেছিলেন, ''আমরা পুরুষানুক্রমে সংস্কৃত ব্যবসায়ী।''

ঈশ্বরচন্দ্র ১৮২৯ সালে ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হলেন। অসাধারণ মেধার অধিকারী ছিলেন তিনি। ফলে বিদ্যালয়ের সব পরীক্ষায় তিনি সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হন। সংস্কৃত কলেজের সমস্ত শিক্ষক তাঁদের এই মেধাবী ছাত্র সম্পর্কে উৎসাহী ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র ইংরেজী, সাহিত্য, অলঙ্কার, স্মৃতি, ন্যায় জ্যোতিষ শ্রেণীতে প্রবেশ করলেন এবং সবক্ষেত্রেও সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে একাধিক বৃত্তি পেলেন। এর পরিমাণ ছিল কখনও পাঁচ টাকা কখনও আট টাকা। তিনি সংস্কৃত কলেজে ইংরেজি পড়েছিলেন, তবে তা ছিল খুবই কম। কিন্তু এর মধ্য দিয়ে তিনি ইংরেজী শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন। ১৮৩৯ সালে অন্যান্য ছাত্রদের সঙ্গে মিলিত হয়ে তিনি জি.টি. মার্শালকে লেখা এক পত্রে জানালেন, 'এই ক্ষণে প্রার্থনা যে অনুগ্রহপূর্ব রীত্যানুসারে আমাদিগের ইংরেজী ভাষাভাষ্যের অনুমতি প্রকাশ হয়, তাহা হইলে ক্রমে রাজকীয় কার্য ও শিল্পাদি বিদ্যা জানিয়া লৌকিক কার্য নির্বাহে সমর্থ হইতে পারি''। ইংরেজী বিদ্যার প্রতি তাঁর আগ্রহের অন্যতম সূত্র ছিল এই যে পুরস্কার প্রাপ্ত বইয়ের মধ্যে কিছু ইংরেজি পুস্তকও ছিল। গ্রীসের ইতিহাস, ব্রিটিশ ইন্ডিয়ার ইতিহাস, ইতিহাস প্রকরণ, ইংরেজী কবিতার সংকলন প্রভৃতি ছিল।

আদালতে জজ পণ্ডিতদের জন্য নির্ধারিত হিন্দু ল কমিটির পরীক্ষা তিনি দিয়েছিলেন ১৮৩৯ সালে। এখানেও তিনি সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হন। এখানে প্রদত্ত শংসা পত্রে লেখা হয়, ''Iswar Chandra Vidyasagar was found and declared to be qualified by his eminent knowledge of the Hindu Law''। এরপরই তিনি 'বিদ্যাসাগর' বিশেষণে সর্বত্র পরিচিত লাভ করেন। সংস্কৃত কলেজে প্রায় তেরো বছর অধ্যায়ন করেছিলেন। অধ্যায়ন শেষে তিনি গ্রামে ফিরে আসেন নি। কলকাতাতেই থেকে যান। জি. টি মার্শালের সুপারিশে তিনি ১৮৪১ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে শেরেস্তাদার বা প্রধান পণ্ডিতের চাকরি পেলেন। সাহেবদের বাংলা পড়ানোর দায়িত্ব ছিল তাঁর ওপর। এই পর্যায়ে বিদ্যাসাগর যেমন ছাত্রদের বাংলা এবং সংস্কৃত ভাষা সম্পর্কে জ্ঞান দান করেছিলেন, তেমনই তিনি নিজে ছাত্রদের কাছ থেকে বেশ কিছু শিক্ষা লাভ করেন। বিশেষত এই শিক্ষাদানের মধ্য দিয়ে তিনি ইংরেজ চরিত্র সম্পর্কে সম্যক উপলব্ধি করেছিলেন। আবার একই সাথে পাশ্চাত্য জ্ঞান-চর্চার সাথে তিনি পরিচিত হন। এর পাশাপাশি বিদেশিদের বাংলা শেখানোর সময় বাংলা ভাষা সম্পর্কে তাঁর বিশেষ আগ্রহ তৈরি হয়। এর মধ্যে দিয়ে উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক রচনায় তিনি আগ্রহী হয়ে ওঠেন। এই শিক্ষাদানের জন্য ইংরেজী ভাষা চর্চাতেও তিনি মনোনিবেশ করলেন। তাঁকে হিন্দিও শিখতে হয়েছিল। চাকরির দায়দায়িত্ব পালনের পর দিনের শেষে তিনি ভাষা শিক্ষা করতেন।

মার্শাল সাহেবের পাশাপাশি ডঃ ময়েটের সাথে তাঁর পরিচিত ঘটে। তৎকালীন সময়ে 'কাউন্সিল অব এডুকেশন' দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার নিয়ামক ছিল। ডঃ ময়েটের সাথে পরিচিতির মধ্যে দিয়ে তিনি এই সংস্থাটি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হ'ন। পরবর্তীকালে এই পরিচিতি শিক্ষা সংস্কারের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরকে বেশ সহায়তা দিয়েছিল।

পাঁচ বছর চাকরির পর বিদ্যাসাগর ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ছেড়ে ১৮৪৬ সালে সংস্কৃত কলেজে যোগ দেন। তখন এই কলেজের কর্ণধার ছিলেন একজন ইংরেজ। এই কলেজে তিনি অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারির দায়িত্ব পেয়েছিলেন। সংস্কৃত কলেজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে এবং পাঠ্যক্রম শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্পর্কে মাঝে মধ্যে তিনি প্রস্তাব দিতেন। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সম্পাদক তা উপেক্ষা করতেন। ফলে তিনি কলেজের পরিচালনা সম্পর্কে বিস্তৃত এক রিপোর্ট পেশ করেন। কিন্তু সম্পাদক এটি অগ্রাহ্য করলেন, যদিও রিপোর্টটি মার্শাল সাহেবের খুব পছন্দ হয়েছিল। যাইহোক, রিপোর্ট অগ্রাহ্য হওয়ায় বিদ্যাসাগর বেশ ক্ষুব্ধ হলেন এবং চাকরি ছেড়ে দিলেন। তখনও তাঁর সাংসারিক অভাব কাটেনি। তা সত্ত্বেও অন্যায়ের সাথে তিনি আপস করতে রাজি হ'ননি। এরপর মার্শাল তাঁকে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের হেড রাইটার ও কোষাধ্যক্ষের পদে নিয়োগ করলেন। এই সময় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক অক্ষয় কুমার দত্তের সাথে তাঁর পরিচিতি ঘটে। এই পত্রিকাটি তখন বাংলা ভাষা সংস্কারের লক্ষ্যে কাজ করছিল।

এরপর বিদ্যাসাগর আবার সংস্কৃত কলেজে যোগ দিলেন। এই কলেজে

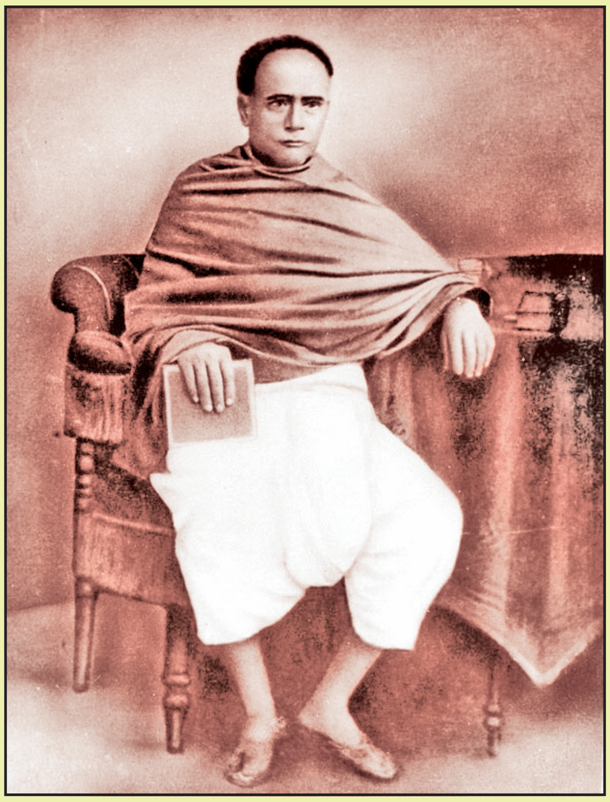

যোগদান করেই তিনি এর পঠন-পাঠনের উন্নতির জন্য মনোনিবেশ করলেন। তাঁর অভিমত ছিল বাংলা ভাষার চর্চা গুরুত্ব সহকারে শুরু করতে হবে। এখান থেকে যেসব ছাত্র পাশ করে বেরুবে তারা উন্নতমানের শিক্ষক হবে। বিদ্যাসাগর চেয়েছিলেন এই কলেজ থেকে যারা পাশ করে বেরুবে তারা সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক হবে। তিনি মনে করতেন, প্রাথমিকভাবে শিখতে হবে মাতৃভাষা। এর মধ্য দিয়ে সংস্কৃত কলেজে বাংলা ভাষা চর্চার এক নতুন অধ্যায় শুরু হলো। ১৮৫১ সালে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পদে আসীন হলেন।

স্ত্রী শিক্ষা বিষয়ে বিদ্যাসাগরের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অবশ্য স্ত্রী শিক্ষা বিষয়ে ভাবনা-চিন্তা পূর্ব থেকেই ছিল। এ বিষয়ে ভাবনা-চিন্তা ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই শুরু হয়। কলকাতায় জুভেনাইল পাঠশালা বালিকাদের শিক্ষার জন্য ১৮২০ সালে স্থাপিত হয়েছিল। এরপরই প্রতিষ্ঠিত হয়, ''ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি''। এক্ষেত্রে ইংরেজ মহিলারা এগিয়ে এসেছিলেন। অনেকের মতে এক্ষেত্রে এ দেশীয় মানুষদের প্রতি কিছুটা কৃপা প্রদর্শনের মানসিকতা ছিল। খ্রিষ্টান ধর্মের প্রতি আকর্ষণ তৈরির কিছুটা ইঙ্গিত কিনা, এই প্রশ্ন ছিল। এক্ষেত্রে ড্রিঙ্ক ওয়াটার বেথুনের উল্লেখযোগ্য উদ্যোগের বিষয়টি সকলেই অবগত আছেন।

বেথুনের উদ্যোগের সহায়তায় বিদ্যাসাগর এগিয়ে এলেন। বেথুনের প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়ে সেক্রেটারি হয়েছিলেন বিদ্যাসাগর। মদনমোহন তর্কালঙ্কার স্ত্রী শিক্ষার সমর্থনে দীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। নিজ গ্রামে মাতা ভগবতী দেবীর নামে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনে বিদ্যাসাগরের উদ্যোগের বিষয়টি সর্বজনবিদিত।

তৎকালীন ছোটলাট হ্যালিডে (১৮৫৪) আদর্শ বাংলা বিদ্যালয়গুলি স্থাপনের জন্য স্থান নির্বাচন করতে বিদ্যাসাগরকে দায়িত্ব অর্পণ করেন। বিদ্যাসাগর গ্রামে গ্রামে ঘুরলেন। শিয়াখালা, বইরানগর, কৃষ্ণনগর, ক্ষীরপাই, চন্দ্রকোণা, কামারপুকুর, রামজীবনপুর, কেশপুর প্রভৃতি গ্রাম পরিদর্শন করেন। স্ত্রী শিক্ষা প্রসারের জন্য তিনি অপরিসীম পরিশ্রম করেন। তাঁর এই পরিশ্রমের পরিণতিতে ১৮৫৫ সালের ২২ আগস্ট থেকে ১৮৫৬ সালের ১৪ জানুয়ারি এই সময়ের মধ্যে বিদ্যাসাগর সাকুল্যে স্থাপন করেন কুড়িটি আদর্শ বিদ্যালয়। নদীয়া, বর্ধমান, হুগলি ও মেদিনীপুর- এই চারটি জেলার প্রতিটিতে পাঁচটি করে, এরপর ১৮৫৭ সালের ২৪ নভেম্বর থেকে ১৮৫৮ সালের ১৫ মে এই সময়ের মধ্যে বিদ্যাসাগর মোট ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। হুগলি জেলায় ২০টি, বর্ধমান জেলায় ১১টি, মেদিনীপুর জেলায় ৩টি এবং নদীয়া জেলায় একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন তাঁর অনন্য কীর্তি।

সমকালীন নারীদের অবস্থা বিশেষত বিধবা, বাল্য বিধবা, বহু বিবাহ, কৌলিন্য প্রথা প্রভৃতি বিদ্যাসগরকে পীড়িত করতো। তিনি তাঁর মা, ঠাকুরমাকে দেখেছেন। দেখেছেন তাঁর বাল্য সহচরীদের - যাঁরা অল্প বয়সে স্বামী হারিয়ে একাদশীর দিন নির্জলা উপবাস করতে বাধ্য হয়েছে। গভীর মর্মবেদনা নিয়ে বিদ্যাসাগর এই যন্ত্রণা দেখে এর প্রতিকারের শপথ গ্রহণ করেন। বিধবা বিবাহ চালু করতে তাঁকে বহু বাধার সম্মুখীন হতে হয়। সেই সময়ের অন্যতম বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব রাধাকান্ত দেবের সাহায্য তিনি প্রার্থনা করেছিলেন। বিদ্যাসাগরের শাস্ত্র বিচার পছন্দ বা সমর্থন করলেও রাধাকান্তদেব বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহের উদ্যোগকে সমর্থন করলেন না।

বিদ্যাসাগর উপলব্ধি করেছিলেন যে বাল্য বিবাহের পরিণতিতে বিধবার সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটে। তিনি মনে করতেন বাল্য বিবাহ সমাজের অভিশাপ এবং এজন্যই সমাজের বিধবার সংখ্যা বাড়ছে। তিনি প্রথমে লিখলেন 'বাল্যবিবাহের দোষ' নামক রচনা ১৮৫০ সালে 'সর্বশুভকরী' পত্রিকায়। এরপর ১৯৫৪-৫৫ সালে লিখলেন বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব (প্রথম ও দ্বিতীয়) দুটি বই। এই পুস্তকে শাস্ত্রীয় বচনের একের পর এক উদ্ধৃতি দিয়েছেন বিধবা বিবাহের সমর্থনে। এই পুস্তকের শেষে তিনি লিখেছেন, ''ধন্য রে দেশাচার! তোর কি অনির্বচনীয় মহিমা! তুই তোর অনুগত ভক্তদিগকে, দুর্ভেদ্য দাসত্ব শৃঙ্খলে রাখিযা, কি একাধিপত্য করিতেছিস''। বিধবা বিবাহের সমর্থনে ভারতবর্ষের আপামর জনগণের নিকট তিনি আবেদন করেন। একইসঙ্গে সরকারের নিকটও তিনি আবেদন করেন। শেষ পর্যন্ত প্রচণ্ড বাধা বিপত্তিকে অগ্রাহ্য করে ১৮৫৬ সালে বিধবা বিবাহ আইন পাশ হয়।

বিদ্যাসাগরের সাংসারিক জীবন খুব যে সুখের ছিল তা বলা যায় না। তাঁর পুত্র নারায়ণ বিধবা বিবাহ করেছিলেন। ফলে বিদ্যাসাগর উৎসাহিত হয়েছিলেন। কিন্তু যখন নারায়ণ তাঁর স্ত্রীকে ত্যাগ করেন, তখন বিদ্যাসাগর ছিলেন নির্মম। পুত্রের এহেন আচরণে আহত হন। তাঁর উইলে পুত্রকে কিছুই দিয়ে যাননি। তাঁর মৃত্যুর তিন বছর আগে ১৮৮৮ সালে তাঁর স্ত্রী দানময়ী দেবী প্রয়াত হন। আর ১৮৯১ সালের ২৯শে জুলাই বিদ্যাসাগর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

।। দুই ।।

বিদ্যাসাগরের সময়টি ছিল বাংলার নবজাগরণের যুগ বা সমাজ সংস্কারের কাল। প্রধানত রাজা রামমোহন রায় থেকে শুরু হয়ে বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, ডিরোজিও, বঙ্কিমচন্দ্র হয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন এই যুগের মহানায়ক। সামাজিক ও ঐতিহাসিক পরিবর্তনকালে ব্যক্তির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার বিষয়টি সবসময়েই সমাজবিজ্ঞানীরা স্বীকার করেছেন, মার্কসবাদীরা তা অস্বীকার করেননি। একথা সর্বজনবিদিত যে সামাজিক ভালমন্দ বিচারের মানদণ্ডগুলির যখন পরিবর্তন হয়, তখনই সামাজিক পরিবর্তনের সূচনা ঘটে। সমাজের পরিবর্তন হলে পরিবর্তিত হয় সামাজিক মূল্যবোধগুলিও। এই পরিবর্তনের ব্যক্তির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। প্রেক্ষাত্রকের মতে, ''As human reason can triuiumph over blind necessity only by becoming aware of the latter's inner loss, only by beating it with its own strength, the development of knowledge, the developmen of human consciousness, is the greatest and most noble task of the humanity.'' চিন্তাশীল ব্যক্তির এই মহোত্তম কর্তব্যই সারাজীবন বিদ্যাসাগর পালন করেছিলেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে বিদ্যাসাগরের সামাজিক ব্যক্তিত্ব সবল ও উন্নত হলেও, তার মধ্যে যে কিছু অন্তর্বিরোধ ছিল তা অস্বীকার করা যায় না। প্রসারও ছিল সীমাবদ্ধ। প্রথমত বিদ্যাসাগরের আত্মপ্রতিষ্ঠানমুখী ব্যক্তিত্ব থাকার ফলে, ধীরস্থিরভাবে কোনো সামাজিক প্রতিষ্ঠান তিনি গড়ে তোলেননি। এটা ঠিক যে অনেক প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা এমনকি ভিত্তি স্থাপন করলেও ধৈর্য ধরে একটি বড় প্রতিষ্ঠান তিনি গড়ে তুলতে পারেননি। অবশ্য এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ছিল সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরি ও মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন। এই দুটি ক্ষেত্রে তাঁর ব্যক্তিগত মত অনুযায়ী কাজ পরিচালনায় সুযোগ ছিল বলে সহকর্মীদের সঙ্গে তাঁর কোনো বিরোধ হয়নি। তাঁর ব্যক্তি সত্তার সঙ্গে কর্মক্ষেত্রে যখন কোনো বিরোধ হয়েছে, সেখানে তিনি কোনো আপস করে চলেননি। কোনো কোনো বুদ্ধিজীবীর মতে তাঁর প্রতিষ্ঠাপ্রবণ ব্যক্তিত্ব সমকালীন ও রাজনৈতিক সভাসমিতির প্রত্যক্ষ নেতৃত্ব ও সান্নিধ্য থেকেও সারাজীবন তাঁকে দূরে রেখেছে, যেখানে তাঁর আদর্শের সঙ্গে কোনো সংঘাত হয়নি। সেক্ষেত্রে তিনি সেসব প্রতিষ্ঠান থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছেন। এর একটি বৃহৎ দৃষ্টান্ত হল 'ভারতসভা'। এই প্রতিষ্টানটিই আমাদের দেশের সমকালীন সময়ে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের প্রথম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। বিদ্যাসাগর এই ধরনের প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার বিরোধী ছিলেন না। ১৮৭৬ সালে যখন ভারতসভা প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগী কর্মীরা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সাথে দেখা করে তাঁকে এর প্রথম সভাপতি হওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। তখন একটি অজুহাত দিয়ে তিনি এই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন।

এ সম্পর্কে শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর আত্মচরিতে লিখেছেন, ''যখন একটা সভা স্থাপন এক প্রকার স্থির হইল, যখন একদিন আনন্দমোহনবাবু ও আমি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত দেখা করিতে গেলাম। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এরূপ প্রস্তাবে বিশেষ উৎসাহ ছিল। তিনি বলিলেন, এতৎদ্বারা দেশের একটি মহৎ অভাব দূর হইবে। আমরা তাঁহাকে আমাদের প্রথম সভাপতি হইবার জন্য অনুরোধ করিলাম, কিন্তু তিনি শারীরিক অসুস্থতার দোহাই দিয়া সে অনুরোধ অগ্রাহ্য করিলেন। কে কে এই

দশম পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

Editor : SUMIT BHATTACHARYA
SANGRAMI HATIAR
State Co-ordination Committee
48th Year, 5th Issue, September 2019
Regd. No. : 18484/71
Price : Two Rupees

রাজ্যের স্বাস্থ্য আধিকারিকের কাছে ডেপুটেশন ও জমায়েতের কর্মসূচী

ডেপুটেশন কর্মসূচীতে উপস্থিত নার্সিং কর্মচারীরা

বর্তমানে রাজ্যে বিরাজমান এক কঠিন ও প্রতিকূল পরিস্থিতি এবং আর্থিক বঞ্চনায় আক্রান্ত রাজ্যের অন্যান্য সরকারী কর্মচারীদের সাথে নার্সিং কর্মচারীরাও প্রতি মুহূর্তে অনুভব করছেন। নার্সিং কর্মচারীদের কি অর্ন্তবিভাগ, কি বর্হিবিভাগ– হয়রানিমূলক বদলি, অমূলকভাবে ও যথাযথ তদন্ত ছাড়াই শোকজ, সাসপেনশনের মতো যন্ত্রণা প্রতিমুহূর্তে ভোগ করতে হচ্ছে, যে অভিজ্ঞতা তাঁদের অতীতে ছিল না। প্রতিমুহূর্তে আমরা আমলাদের ষড়যন্ত্রের শিকার হচ্ছি, যার ফলে বৃহৎ সংগঠন ওয়েস্ট বেঙ্গল নার্সেস এ্যাসোসিয়েশনকেও ভেঙে টুকরো টুকরো করার প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হচ্ছে।

এমনই এক মুহূর্তে জীবন যন্ত্রণাকে প্রশমিত করার লক্ষ্যে ওয়েস্ট বেঙ্গল নার্সেস এ্যাসোসিয়েশন-এর আহ্বানে চিরাচরিত প্রথায় প্রতিবাদ-জমায়েত ও স্বাস্থ্য আধিকারিক (D.H.S.)-এর কাছে ডেপুটেশনের কর্মসূচীতে গত ২৪ সেপ্টেম্বর '১৯ লবণহ্রদের বৈশাখী মোড়ে মিলিত হয়েছিলেন রাজ্যের পাহাড় থেকে দক্ষিণের নদীমাতৃক সমস্ত জেলার দায়িত্বশীল ও প্রতিবাদী নার্সিং কর্মচারীরা। প্রচণ্ড প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে উপেক্ষা করে এবং কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়াই সুশৃঙ্খলভাবে ওয়েস্ট বেঙ্গল নার্সেস এ্যাসোসিয়েশনের সদস্য বন্ধুরা এই কর্মসূচীকে সাফল্যমণ্ডিত করেন।

D.H.S.-এর কাছে সমিতির চারজন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ডেপুটেশনে যান। DHS করণীয় বিষয়গুলি করার আশ্বাস দেন এবং কিছু বিষয় ইতিমধ্যেই অর্থ দপ্তরে পাঠিয়েছেন বলেন।

এই জমায়েত কর্মসূচীতে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির যুগ্ম সম্পাদক বিশ্বজিত গুপ্তচৌধুরী উপস্থিত ছিলেন এবং বক্তব্যও রাখেন। সভা পরিচালনা করেন ছবিঘাটা হালদার, সস্তিকা মুখার্জী ও সীমা সাহা। সভায় দাবীপ্রস্তাব পেশ করেন সমিতির যুগ্মসম্পাদিকা নিবেদিতা দাশগুপ্ত এবং সমর্থনে বক্তব্য রাখেন সমিতির সাধারণ সম্পাদিকা গীতা দে। □

পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারী সমিতির শতবর্ষে বর্ষব্যাপী অনুষ্ঠান

মৌলালী যুবকেন্দ্রে শতবর্ষের অনুষ্ঠান।

অনেক ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে চড়াই উৎরাই অতিক্রম করে লড়াই আন্দোলনের পথই কর্মচারীদের অধিকার ছিনিয়ে আনা সহ অধিকার রক্ষা করার শ্রেষ্ঠ দর্শন এ ভাবনায় ভাবিত হয়েই কর্মচারী সমিতি W.B.M.O.A পথ চলেছে। এক গৌরবজ্জ্বল অধ্যায়ের মধ্যে আজ আমরা প্রবেশ করেছি। এটি কোনো মামুলি বিষয় নয়। একদিকে পরাধীন ভারতে প্রায় তিন দশক এবং স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে সাত দশকের উপর সমিতি তার কার্যকলাপ চালিয়েছে। অনেক ভয় ভীতি, কর্মচারীদের ঘরছাড়া করা, দুরদুরান্তে বদলী, কারাবরণ, চাকরী থেকে অন্যায়ভাবে বরখাস্ত করার ঘৃণ্য চক্রান্ত সমিতির বুনিয়াদকে নষ্ট করতে পারেনি। বরং দিন দিন ঘৃণ্য ঘটনা প্রবাহের মধ্যে দিয়ে কর্মচারীরা একত্রিত হয়েছে সমিতির পতাকা তলে। শুধুমাত্র কর্মচারী সমস্যা নয় স্বাধীনতার পূর্বে পরোক্ষভাবে স্বাধীনতা আন্দোলনে, বঙ্গভঙ্গ চক্রান্তের বিরুদ্ধে আন্দোলনে,

▶▶ *নবম পৃষ্ঠার পঞ্চম কলমে*

উদ্বোধনে ৩৫তম শারদ সমন্বয়

এক ঐতিহাসিক সময়ের সন্ধিক্ষণে যখন প্রিয় সমিতির শতবর্ষ পালিত হচ্ছে, সেই সময়ে গত ২০ সেপ্টেম্বর '১৯ ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট হলে ৩৫তম শারদ সমন্বয় প্রকাশনা অনুষ্ঠান সম্পন্ন হলো। এই অনুষ্ঠানে উদ্বোধক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা কর্পোরেশনের প্রাক্তন

▶▶ *চতুর্থ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে*

শারদ সমন্বয়ের প্রচ্ছদ উদ্বোধন করছেন বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য

১৬ সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারী পেনশনার্স সমিতির কর্মসূচী

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারী পেনশনার্স সমিতির আহ্বানে বিগত ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯ অশক্ত শরীর নিয়ে কলকাতার রাজপথে প্রতিবাদ কর্মসূচীতে সামিল হলেন অবসরপ্রাপ্ত রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা। চিকিৎসার সুযোগ, ন্যায্য বিধিবদ্ধ পেনশন, বকেয়া মহার্ঘ্যভাতার দাবিতে একই সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্রমাগত স্বল্প সঞ্চয়-এর আমানতের ওপর সুদ কমানোর বিরুদ্ধে মিছিল ও সমাবেশে সামিল হলেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারী পেনশনার্স সমিতির ডাকে। মিছিলে তাঁরা প্রশ্ন তোলেন রাজ্যে মন্ত্রী বিধায়কদের ভাতা পেনশন বাড়ে অথচ সেই সরকারেরই অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীরা এত বঞ্চনার শিকার কেন হবেন? রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী তাঁর মাসিক বেতন বাড়িয়ে নিয়েছেন ১ লক্ষ ১৭ হাজার টাকায়। ২০১৬ সালের পর থেকে রাজ্যের সরকার দফায় দফায় সমস্ত মন্ত্রী, বিধায়কদের বেতন বাড়িয়ে নিয়েছেন অথচ অবসরপ্রাপ্ত রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রে সঠিকভাবে নিয়ম মেনে পেনশনের পরিমান বাড়ছে না, বাকি রয়েছে ৪৮ শতাংশে মহার্ঘভাতা, প্রায়শই মেলেনা ন্যূনতম চিকিৎসার সুযোগ সুবিধা। এরপর স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্প থেকে তাদের আমানতের ওপর ক্রমাগত সুদের পরিমান কমাচ্ছে কেন্দ্রের মোদী সরকার। বর্তমান রাজ্য সরকার এবং একই সঙ্গে কেন্দ্রের সরকারের অমানবিক ও শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী আচরণের বিরুদ্ধে কলকাতা ও কলকাতা সংলগ্ন আটটি জেলার সদস্যবন্ধুরা এই মিছিল ও সমাবেশে সামিল ছিলেন। কলকাতার সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে ৯ দফা দাবীতে শুরু হওয়া এই মিছিলে অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের সঙ্গে পথ হাটেন রাজ্য বিধানসভার বামপরিষদীয় দলনেতা ডঃ সুজন চক্রবর্ত্তী, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিজয়শঙ্কর সিংহ সহ রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতৃবৃন্দ। মিছিল শেষে সভা হয় শিয়ালদহ রেলওয়ে স্টেশন সংলগ্ন এলাকায়। সভার শুরুতে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারী পেনশনার্স সমিতির সাধারণ সম্পাদক সত্য বসু দুটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। একটি প্রস্তাব ষষ্ঠ বেতন কমিশন সংক্রান্ত যেখানে অবসর প্রাপ্তদের বঞ্চনা করার এক ষড়যন্ত্র চলছে বলে স্পষ্ট অভিযোগ করা হয়। অপর প্রস্তাব মোট ৯ দফা দাবিসনদের সমর্থন জানিয়ে নেওয়া হয়। সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিজয়শঙ্কর সিংহ বলেন রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের ওপর বঞ্চনা ও হামলা চলছে। কর্মরত এবং অবসরপ্রাপ্ত রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা বর্তমান রাজ্য সরকারের জমানায় ক্রমাগত বঞ্চিত। বামফ্রন্ট সরকারের সময়কালে আমরা পাঁচটি বেতন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী প্রাপ্য সুযোগ সুবিধা পেয়েছি। মহার্ঘ্য ভাতাও ছিল নিয়মিত। আর এখন চার বছর অপেক্ষা করেও ষষ্ঠ বেতন কমিশনের সুপারিশ কার্যকর হল না। এর বিরুদ্ধে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতৃত্বে ধারাবাহিক আন্দোলন কর্মসূচী জারি থাকবে।

ওয়েলিংটন থেকে শিয়ালদহ অভিমুখে মিছিল।
ইনসেটে বক্তা ড. সুজন চক্রবর্তী।

সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে সুজন চক্রবর্তী বলেন দুই সরকারের বিরুদ্ধেই বিরোধিতার মিছিল, সভা-সমাবেশ ক্রমশ বাড়ছে। মানুষ এখন বুঝিয়ে দিচ্ছেন এই অন্যায় আর অপশাসন তারা বরদাস্ত করবেন না। তিনি বলেন রাজ্য সরকারের অমানবিকতার সঙ্গে কেন্দ্রের মোদী সরকারের বর্বরতার কোনো ফারাকই মানুষ খুঁজে পাচ্ছেন না। কর্মসংস্থান হচ্ছে না। নতুন করে বেকার বাহিনী তৈরী হয়েই চলেছে। অবসরকালীন ভাতা যে কোন দয়ার দান নয় তা মানতে নারাজ এই সরকারগুলি। সামাজিক সুরক্ষা যা ছিল তাকেও শেষ করার ষড়যন্ত্র চলছে কর্পোরেটদের স্বার্থে। দেশভক্তির ভ্রান্ত প্রচারের আড়ালে সার্বভৌমত্বকেও বন্ধক রাখার যে আয়োজন তার বিরোধিতায় মানুষ সব রাজপথ ও গ্রাম সড়কের দখল নিচ্ছেন। তিনি বলেন আগামী ২০ সেপ্টেম্বর কলকাতার রানী রাসমনি অ্যাভিনিউ-এ এক বড় সমাবেশের আহ্বান জানানো হয়েছে। সেখানে সব রাষ্ট্রায়ত্ত্ব শিল্প উদ্যোগের বিলগ্নীকরণের অপপ্রয়াস রুখতে এবং শ্রমজীবী মানুষের ওপর উপর্যুপরি হামলার প্রতিবাদে আগামীর আন্দোলনের ডাক দেওয়া হবে। সাম্প্রতিক সময়ে ছাত্র যুবদের উপর পুলিশের হামলার প্রতিবাদে বুকে কালো ব্যাজ ধারণ করেন উপস্থিত অবসর প্রাপ্ত রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা। □

কৃষি কারিগরী কর্মী সংস্থার প্রতিষ্ঠা দিবস এর কর্মসূচী

প্রতিষ্ঠা দিবসের কর্মসূচীর একাংশ

কৃষি কারিগরী কর্মী সংস্থার ৬৩তম প্রতিষ্ঠা দিবস এর কর্মসূচী প্রতিপালন করা হল বিগত ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৯ শুক্রবার সমিতির কেন্দ্রীয় দপ্তর ৭১ সার্পেনটাইন লেন শিয়ালদহ স্থিত সমিতি ভবন-এ। প্রতিষ্ঠা দিবস পালন কর্মসূচীর শুরুতেই রক্তপতাকা উত্তোলন এবং শহীদ বেদীতে মাল্যদান করা হয়। সমিতির রক্তপতাকা উত্তোলন করেন কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি অমিতাভ সাহা। পরবর্তীতে সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, এদিনের কর্মসূচীর প্রধান অতিথি সুমিত ভট্টাচার্য সহ উপস্থিত সমিতির কলকাতার পার্শ্ববর্তী ৯টি জেলার সম্পাদকগণ এবং সমিতির প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদকগণ শহীদ বেদীতে মাল্যদান করেন। সূচনাপর্বের এই অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সমিতির অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক রুদ্রকান্ত ভট্টাচার্য। পরবর্তীতে গণসংগীত পরিবেশন করেন সমিতির কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক টিম।

প্রতিষ্ঠা দিবসকে সামনে রেখে এদিন সমিতি ভবনে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য তথা সংগঠনের মুখপত্র সংগ্রামী হাতিয়ার পত্রিকার সম্পাদক সুমিত ভট্টাচার্য। আলোচনা সভা পরিচালনা করেন সমিতির সভাপতি অমিতাভ সাহা। সভাপতি কর্তৃক প্রধান অতিথিকে মঞ্চে আহ্বান পরবর্তীতে সমিতির সাধারণ সম্পাদক সুনির্মল রায় পুস্পস্তবক দিয়ে প্রধান অতিথিকে সম্বর্ধিত করেন পরবর্তীতে প্রধান অতিথি ৬৩টি আলো প্রজ্জ্বলিত করে প্রতিষ্ঠা দিবসের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন।

প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখতে গিয়ে সমিতির সাধারণ সম্পাদক সুনির্মল রায় বলেন ১৯৫৬ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর বিভাগীয় কর্মচারী ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে এক হাজারের অধিক কর্মচারী জমায়েতের মধ্য দিয়ে সমিতির জন্ম হয়। এরপর শুরু হয় সমিতির নেতৃত্বে ছাঁটাই বিরোধী সংগ্রাম। শুরুতে সমিতির নাম ছিল ট্রাক্টর ডিভিশন এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন। আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ব্যাপক ছাঁটাই বন্ধ করা গেল, সাথে সাথে ছাঁটাই কর্মচারীদের বিকল্প কর্মসংস্থান সম্ভব হল। সমিতির এই সাফল্য কর্মচারীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করল। ঐ বছরেই অর্থাৎ ১৯৫৬ সালে জন্ম হল পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকারী

▶▶ *চতুর্থ পৃষ্ঠার পঞ্চম কলমে*

সম্পাদক ঃ সুমিত ভট্টাচার্য
সহযোগী সম্পাদক ঃ মানস কুমার বড়ুয়া
যোগাযোগ ঃ দূরভাষ-২২৬৪-৯৫৯৩, ২২৬৫-০৯২৬ ফ্যাক্স ঃ ০৩৩-২২১৭-৫৫৮৮
ই-মেল ঃ sangramihatiar@gmail.com
ওয়েবসাইট ঃ www.statecoord.org
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষে অজয় মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ১০-এ শাঁখারীটোলা স্ট্রীট, কলকাতা-১৪, হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কোঃ অপঃ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিঃ ১৩ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত।